কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ

ছিন্নমস্তার মন্দির

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
নং ২৫২৪৮
তাং
কলিকাতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

=উপহার=

ডান্স-এ্যাণ্ড-ষ্টার-হাশ্‌লার্স দল-বন্ধে
কবির রচিত কথা নট-নাচ-ছন্দে
"চিত্রাঙ্গদা"-ছবি স্বপন-মাধুর্য্যে
সুরে-রসে আঁকিলে যে কল্প-চাতুর্য্যে,
আটাশে জ্যৈষ্ঠ-রাতে তোমাদের সিদ্ধি—
'মন্দিরে' লিখে রাখি। হোক যশোবৃদ্ধি!

২, এলগিন লেন, কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৪৮

শুভার্থী
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

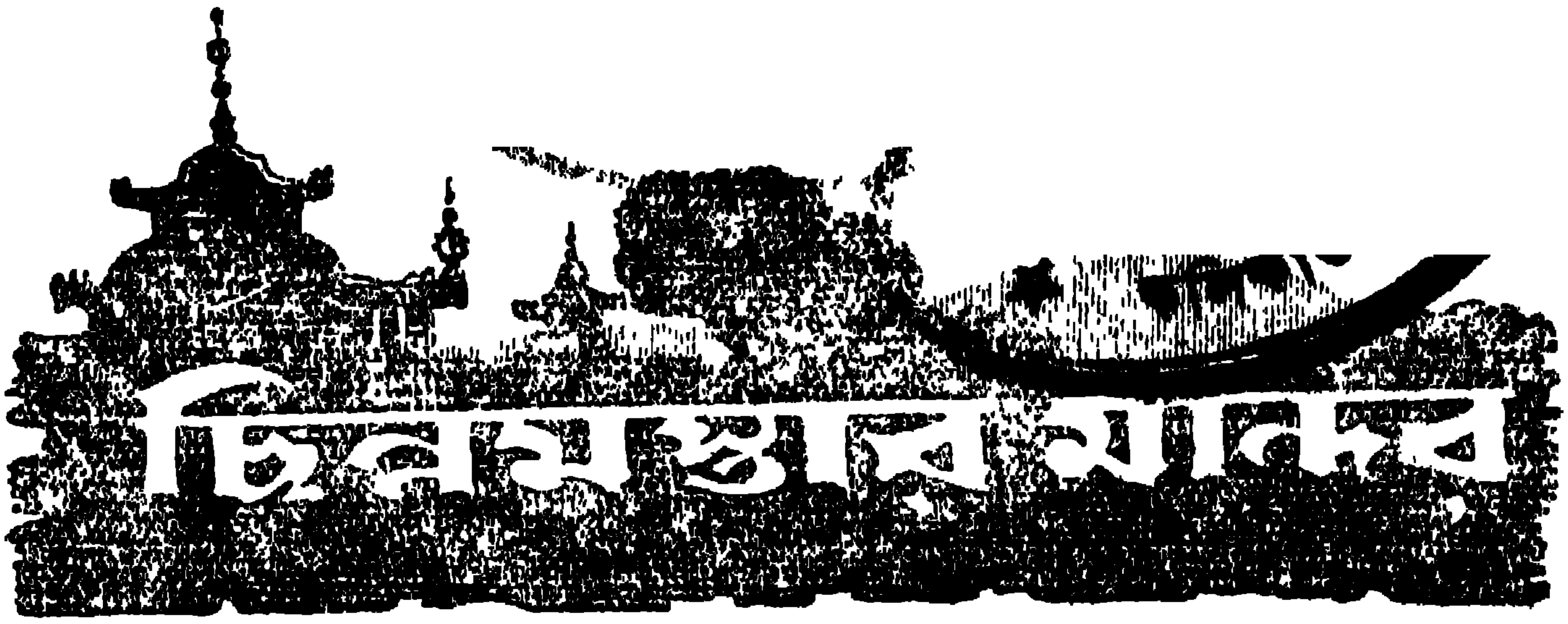

এক

বি-এ এগ্‌জামিন দিয়া প্রকাশ আর হরেন কোমর বাঁধিল,—সামনে লম্বা ছুটী,—সহরের বুকে বসিয়া তারা তাস-পাশা খেলিয়া এ ছুটী কাটাইয়া দিবে না; খুব লম্বা পাড়ি দিয়া বহুদূরে সেই তেপান্তরের মাঠ ঘুরিয়া আসিবে। কোথায় যাইবে, তাহা লইয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় লেকের ধারে বসিয়া দুজনে বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

প্রকাশ বলিল—ছুট্‌ বলতে সকলে যে-সব জায়গায় ছোটে, সে-সব জায়গায় যাবো না। এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে কেউ বড়-একটা যায় না!

হাসিয়া হরেন বলিল—And from whose bourne no traveller returneth (যে-জায়গা হইতে কেহ আর ফিরিয়া আসে না)! তুই এই কথা বলতে চাস্‌ প্রকাশ?

প্রকাশ বলিল—তুই নেহাৎ মুখ্যু, তাই এমন কথা তোর মনে জাগে!

হরেন বলিল—তা বেশ, তুই তো পণ্ডিত-লোক, কোথায়

যাবি, তুইই বল! বসে-বসে জিওগ্রাফি আওড়াস যদি, তাহলে ছুটীর দিনগুলো এদিকে ফুরিয়ে যাবে!

প্রকাশ কহিল—আমার মাথায় একটা যা আইডিয়া জেগেছে…সত্যি, শুনলে তুই লাফিয়ে উঠবি, হরেন!

গভীর আগ্রহে হরেন বলিল—সেই আইডিয়ার কথাই বল্ যে বুঝি!

প্রকাশ কহিল—সে আইডিয়ার কথা বলবার আগে আর একটা কথা বলি, শোন্…

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র। চাঁদ নাই। লেকের দুই তীরে বিজলী-বাতির মালা জ্বলিতেছে…সেখানকার গাছপালার ছায়ায় সে-আলো মিশিয়া চারিদিকে কেমন একটা স্বপ্নময়তার আভাস জাগাইয়া তুলিয়াছে! লেকের দক্ষিণ-গায়ে রেলোয়ে লাইন। সেই লাইনের উপর দিয়া একখানা গুড্স্-ট্রেন গুরু-গম্ভীর শব্দে দীর্ঘ সরীসৃপের মতো ধীর-মন্থর-গতিতে চলিয়াছে শেয়ালদার দিকে।

প্রকাশ নীরবে ক্ষণ-কাল ঐ গতিশীল ট্রেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরেন বলিল—মনে-মনে স্বপ্ন রচনা করছিস্ কি! বল্…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ বলিল—কামরূপ কামাখ্যার কথা শুনেছিস, নিশ্চয়?

হরেন বলিল—তা আর শুনিনি! মস্ত তীর্থ…

প্রকাশ বলিল—তীর্থের কথা বলছি না। এখনো সে-বয়স হয়নি যে তীর্থের নামে নেচে উঠবো! তা নয়।

হরেন বলিল—তবে?

প্রকাশ বলিল—ওখানে না কি সব ভারী অদ্ভুত ব্যাপার হয়! ওখানকার লোক-জন অনেক-রকম তুক্‌তাক্ জানে!

অধীর আগ্রহে হরেন বলিল—শুনেছি, ওখানকার লোক মানুষকে ভেড়া করে দিতে পারে···স্রেফ মন্তর পড়ে!

প্রকাশ বলিল—ভেড়া-টেড়া করা—ও আমি বিশ্বাস করি না। বাজে কথা! তা যদি পারতো, তাহলে ওখান থেকে গাড়ী-গাড়ী মটন্ চালান্ আসতো! তা নয় রে। ওখানে···

হরেনের ত্বর সহিল না! হরেন বলিল—আমি কামাখ্যার কথা জানি। আমার এক পিশিমা সেবার কামাখ্যার মন্দিরে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের আঁচলের ন্যাকড়া খানিকটা এনেছিলেন। আমাকে এক-টুকরো দেছেন। এখনো আমার কাছে আছে। সে-ন্যাকড়ার এমন গুণ যে সঙ্গে নিয়ে যে-কাজে বেরুবি, প্রত্যক্ষ সিদ্ধি-লাভ! এগ্‌জামিন্ দিতে যাস্ যদি, নির্ঘাৎ পাশ্!

প্রকাশ বলিল—এগ্‌জামিনের সময় সে-ন্যাকড়া তুই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলি?

সোৎসাহে হরেন বলিল—নিশ্চয়।

প্রকাশ বলিল—তাহলে তুই পাশ্···কি বলিস? কিন্তু আমি তোর ও-কামাখ্যার মন্দিরের কথা বলছি না। সেখানে আছে ছিন্নমস্তার মন্দির। আমি সেই ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথা বলছি।

হরেন বলিল—আছে না কি? তা জানি না। শুনেছি, কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর মন্দির। সে পাহাড়ের নাম নীলাচল।···কে না কি নরকাসুর ছিল ঐ মন্দিরের রক্ষক···সেই-রক্ষক কামাখ্যা দেবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল···

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—আঃ! তুই চুপ করবি, হরেন? আমি কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কথা বলছি না। আমি বলছি, ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরের কথা। এ মন্দির ঐ কামাখ্যা দেবীর

মন্দিরের কাছে। শুনেছি, নীচে পাহাড়ের কোলে ব্রহ্মপুত্র… সেই ব্রহ্মপুত্রের বুকে আছে উমানন্দ দ্বীপ,—উত্তরে ভুটানের পাহাড়…অর্থাৎ গৌহাটির কাছে।

হরেন বলিল—হয়েছে! এমনি করে যদি বলতে সুরু করিস, তাহলে তোর আইডিয়ার মলাটখানার সঙ্গেই আজ পরিচয় হবে…সে মলাট খুলে আইডিয়ার মধ্যে আর প্রবেশ করা হবে না!

প্রকাশ কহিল—শোন্ না, যা বলি! এত অধীর হলে এর পর জীবনে কি আর কিছু করতে পারবি?

হরেন বলিল—জীবনে পরে কি করতে পারবো না পারবো, অত হিসাব না কষলেও তোর ভূমিকা যদি এই রেটে বেড়ে চলে, তাহলে আজ আর-একটু পরে কি করতে পারবো, তা আমি জানি।

প্রকাশ বলিল—কি করবি, শুনি?

হরেন বলিল—এখান থেকে সটান্ সরে পড়বো। এ্যাদ্দিন ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে এগ্‌জামিনের পড়া পড়েছি। এখন এগ্‌জামিনের পরেও তুই যদি সে-ঘ্যান্‌ঘ্যানানির সুরে সমানে বকতে থাকিস, তাহলে পলায়ন করা ছাড়া আত্ম-রক্ষার আর উপায় কি, বল্?

প্রকাশ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—একজন ইংরেজ লেখক বলে গেছেন, মানুষকে গল্প বলবো কি, গল্প শোনবার যোগ্যতা ক'জন মানুষের আছে!

হাসিয়া হরেন বলিল—আর-কার কতখানি যোগ্যতা আছে, জানিনা প্রকাশ, আমার যোগ্যতা তুই কিন্তু তোর এই ভূমিকাতেই খর্ব্ব করে দিচ্ছিস্! যা বলবি, চট্ করে' বল্।

প্রকাশ বলিল—এই কামাখ্যার কাছে রঙ্গিয়া। রঙ্গিয়া হলো আসাম-বেঙ্গল রেলের একটা জংশন-ষ্টেশন। আমার এক

সে আঘাতে ঘোড়া সামনের দুই পা তুলিয়া লাফ দিল

মামা সেই রঙ্গিয়ার ষ্টেশন-মাষ্টার। মামার কাছে সেবার অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শুনেছি ভাই···ওখানকার দেব-দেবীদের অমানুষিক লীলার গল্প! গাঁজা বলে সে-গল্প উড়িয়ে দিলেও সেই থেকে আমার মনে ইচ্ছে আছে, গিয়ে আসামটা একবার দেখে আসি! এই বিজ্ঞানের যুগে, রিয়ালিষ্টিক যুগে এখনো ঐ সব আষাঢ়ে কথা মানুষ কোন্ মুখে বলতে আসে, আমি তাই ভাবি!

কথাটা শুনিয়া হরেন শুধু প্রকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

লেকের ওপারে দূরে কে গান গাহিতেছিল···জলের বুক বহিয়া সে সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

প্রকাশ বলিল—মামা বলছিল, একজন সাহেব নাকি মন্দির দেখতে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে আমাদের দেব-দেবীদের উপর, আমাদের ভক্তির উপর ঠাট্টা-টিটকিরি করেছিল—শুধু তাই নয়, পোড়া সিগার ফেলেছিল মন্দিরের সামনে। পাণ্ডারা বলেছিল, এমন অন্যায় কাজ করোনা সাহেব, প্রাণে বাঁচবে না! হেসে মন্দিরের পাথরের সিঁড়িতে বুট্ ঠুকে সাহেব বলেছিল,—ফুঃ! তারপর সেই দিন রাত্রে সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে! বলে, মাথা নেই···কে একজন মেয়ে-মানুষ···হাতে মানুষের কাটা এক-গাদা মুণ্ডু নিয়ে সাহেবকে এ্যাটাক্ করতে এসেছিল। সাহেব ভয়ে কাঁপছিল। সে-ভয় তার ঘুচলো না··· ভুল বক্‌তে বক্‌তে কাঁপতে-কাঁপতেই সাহেব শেষ-রাত্রে দেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি হয়ে মারা যায়!

হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ-রেখা···হরেন বলিল,—সত্যি? য্যাঃ···

হাসিয়া প্রকাশ বলিল—মামা বলে, সত্যি। আমি কিন্তু শুনে গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছি! বলেছিলুম, দেবতাদের যদি

তেমন শক্তি-প্রতিপত্তি থাকবে, তাহলে যারা ঐ দেবতাদের মানে, পূজো-অর্চ্চনা করে, তাদের এত দুঃখ-দুর্দ্দশা কেন, বলতে পারো মামাবাবু ?

হরেন বলিল—তামাসা করিস্ নে প্রকাশ! আফ্রিকার ম্যমির গল্প শুনেছিস্ তো! বহু সভ্য জাতের বহু পণ্ডিত ঐ সব ম্যমি নিয়ে কত তাচ্ছল্য, কত ব্যঙ্গ করেছেন! কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাকেও আর প্রাণে বাঁচতে হয়নি!···একটা কথা আমি সার বলে জেনেছি ভাই···সে কথা হচ্ছে, কারো ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিয়ে তামাসা করা উচিত নয়। তাতে মঙ্গল হয় না···অমঙ্গল হয়। না হলে যাদের মতো বাস্তব-বাদী জগতে আর কেউ নেই—মানে, আইন-কর্ত্তা···তাঁরা পেনাল্ কোডে সব জাতের রিলিজস্ সেন্টিমেণ্ট মেনে একটা সেক্শন্ গুঁজে দিতেন না!··· শুনেছি, পরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করলে পেনাল কোডের ধারায় কি-একটা সাজা হয়। ছোটখাট জরিমানা-সাজা নয়; জেল পর্য্যন্ত!···ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলো, আর দেবদেবী বলো·· এই যে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে মানুষের মনে আধিপত্য করছে,···দু পাতা সায়েন্স পড়ে, দুটো এসিড মিশিয়ে কেরামতি করে আমরা ভাবি, ভারী পণ্ডিত হয়ে উঠেছি! সত্যি প্রকাশ, দেবদেবীকে বিশ্বাস না করি, অবিশ্বাসও আমি করি না। ভক্তি-ভরে কালীঘাটের মন্দিরে যাই না কোনো দিন···কিন্তু গেলে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করি। আর সে-প্রণাম ভক্তি-ভরে করি।

প্রকাশ নিঃশব্দে হরেনের কথা শুনিল···তারপর বলিল—আচ্ছা, আমরা যদি রঙ্গিয়ায় যাই? মামার ওখানে গিয়ে উঠবো। তারপর কামাখ্যা দেবীর মন্দির···আরো ওদিকে যা-যা আছে···বক্সা রোড, জয়ন্তী কুচবেহার, পাণ্ডু,···যা পারি, সব দেখে আসবো!

সোৎসাহে হরেন বলিল—ফার্স্ট ক্লাশ হবে। সত্যি! বাঃ! এই তো আমি চাই। বেড়াতে গেলেই সৌখীন বাঙালী-বাবুরা ছোটেন এদিকে দার্জ্জিলিং, কার্শিয়ং, না হয় শিলং; আর ওদিকে মধুপুর, বদ্দিনাথ, গিরিডি, গয়া, নৈনীতাল, দিল্লী, আগ্রা, ডেরাডুন, সিম্‌লা-হিল্‌স্‌, কাশ্মীর!···আমি বলি, ওরে হতভাগা কূপ-মণ্ডুকের দল, পয়সা খরচ করে বেরুচ্ছিস যখন, তখন ঐ বাঁধা-ধরা রুটিন ছেড়ে জবুথবু সভ্য সাজিস্‌ কেন?···চলে যা মণিপুর-কাঞ্চনজঙ্ঘা-তিব্বত! হুঁঃ!···তাহলে আর জল্পনা-কল্পনা নয় প্রকাশ···তুই ব্যবস্থা করে ফ্যাল্‌। আমি রেডি। কাল না হয় পরশু···লেট্‌ আস্‌ ষ্টার্ট টু রঙ্গিয়া···তারপর রঙ্গিয়া থেকে কামরূপ-কামাখ্যা এ্যাণ্ড সাচ্‌ আদার প্লেশেস!

দুই

রঙ্গিয়া ষ্টেশনে দুজনে যখন নামিল, তখনো ভোরের আলো ভালো করিয়া ফোটে নাই।

ষ্টেশনটি বেশ বড়।

হরেন বলিল—মামাকে টেলিগ্রাম করেছিস ?

প্রকাশ বলিল—না। হঠাৎ এসে সকলকে চম্‌কে দেবো, ঠিক করেছি !

হরেন বলিল—দুজনে লগেজ যা এনেছি···

প্রকাশ বলিল—ভয় নেই ! গুড্‌স্‌-সেড্‌ আছে···মামার কোয়ার্টার্সে না ধরে, এ-সব সেখানে থাকবে'খন।

প্রকাশের মামা নিরঞ্জনবাবু রঙ্গিয়ার ষ্টেশন-মাষ্টার। দুজনে সন্ধান লইয়া জানিল, তিনি বাসায় আছেন। এখন তাঁর ডিউটি নয়। তাঁর বাসা ষ্টেশনের বাহিরে পথের ও-ধারে।

বাঙলা। বাঙলার সঙ্গে বাগান আছে। বাগানে নানা ফল-ফুলের গাছ।

কুলির মাথায় লগেজ চাপাইয়া দুজনে চলিল নিরঞ্জনবাবুর বাসায়।

ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া নিরঞ্জনবাবু বাঙলার বারান্দায় একখানা ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন; প্রকাশকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—তুই হঠাৎ কোথা থেকে?

প্রকাশ বলিল—বাড়ী থেকে ···এগ্‌জামিন হয়ে গেল বেড়াতে এলুম। এটি আমার বন্ধু এর নাম হরেন।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এইখানে বোস্…ঐ ক্যাম্প-খাটে। তোর মামীমার ক'দিন অসুখ চলেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। দুটো ছেলের অসুখ। সারা রাত জ্বর গেছে। শেষ-রাত্রে জ্বরটা নেমেছে—এখন ঘুমোচ্ছে। সারা রাত আমার কাল জেগে কেটেছে!

তারপর কুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুই ভিতরে গিয়ে চুপি-চুপি সনাতনকে ডেকে আন্ তো। এদের মুখ-হাত ধোবার জল দিক্…চায়ের জল চড়াক…

কুলি গেল অন্দরে। নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ট্রেনে ঘুম হয়েছিল?

প্রকাশ বলিল—ট্রেনে চড়লে আমার এক-দম্ ঘুম হয় না, মামাবাবু। ঘুমিয়েছে বটে হরেন! ওঃ, কি ঘুম! ট্রেনে উঠেই বিছানা পেতে শোয়া—ব্যস্, রাত্রে একটিবার ওঠেনি!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—হুঁ! ট্রেনে ঘুমোতে পারলে কষ্ট হয় না! তা চাস্ যদি, দুজনে না হয় একটু গড়িয়ে নে। এখন তো সবে এই পাঁচটা বেজে চব্বিশ মিনিট।

প্রকাশ বলিল—না মামাবাবু, ঘুমোবো না। মুখে-চোখে জল দিয়ে একটু বরং ঘুরে আসি। ভারি চমৎকার লাগছে এখানে এই সকাল-বেলাটা।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—কলকাতার ঘিঞ্জি-ভিড়…ভোরেই ময়লা-গাড়ীর হটর-হটর…তারপর রাস্তায় ফড়্ফড়্ করে জল দিচ্ছে। লোকে বলে, প্রভাতকে বন্দনা করতে হয়। তা কলকাতা সহরে বন্দনার যা ঘটা…মানুষ ওখানে আবার মর্ণিংওয়াকে বেরোয়!…এখানে এখনি শুনবি গাছে-গাছে পাখী ডাকছে… কোথায় লাগে তার কাছে তোদের সহরের রেডিয়ো! কলকাতা ছেড়ে যেখানে যাবি, সব জায়গা ভালো লাগবে! কলকাতায়

আমি তো একদণ্ড থাকতে পারি না ! ঐ ভিড়ে আর হট্টগোলে আমার দম্ যেন বন্ধ হয়ে আসে !

প্রকাশ এ-কথার জবাব দিল না ; হরেন চাহিয়াছিল বাহিরে আকাশের প্যানে।

চারিদিক হইতে বনানী প্রশান্ত স্নেহচ্ছায়া বিছাইয়া জায়গাটিকে সযত্নে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ! এখনো সকাল হয় নাই। ইহারি মধ্যে পথে ভুটিয়া পশারীদের ভিড়। হন্-হন্ করিয়া তারা পথ চলিয়াছে···নিঃশব্দে···কোথায়, কে জানে !

প্রকাশ বলিল—এত কিসের পশারী, মামাবাবু ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এটা ব্যবসার দেশ রে ! ভুটিয়ারা আসে···অঢেল গালা, লঙ্কা নিয়ে আসে। তাছাড়া ভুটান খুব কাছে কিনা, ভুটানীরা আনে কম্বল, টাট্টু-ঘোড়া, ছাগল, ভুটিয়া-কুকুর।

হরেন একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আমরা আফিসে কেরাণীগিরি খুঁজে মরি, অথচ দেশের মায়া কাটিয়ে একটু যদি দূরে বেড়িয়ে আসি, তাহলে আমাদের এই বাবুর দল অভাব-দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান !

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—কেরাণীগিরির নাগ-পাশই বাঙালী-জাতটাকে বেঁধে মারছে, বাবা।

প্রকাশ বলিল—এ সব দেশে আমাদের অনেক ইতিহাস বোধ হয় জড়িয়ে আছে ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আছেই তো ! এই রঙ্গিয়া থেকে একটা ব্র্যাঞ্চ-লাইন গেছে রঙ্গপাড়া। ওদিকে বহু চা-বাগান। তার উপর রঙ্গপাড়ার ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের উপর তেজপুর বলে একটা জায়গা আছে। খাশা জায়গা। এই তেজপুর ছিল আমাদের পুরাণের শোণিতপুর। আসামী-ভাষায় 'তেজ'

কথার মানে হলো 'রক্ত', 'শোণিত'। শ্রীকৃষ্ণর এক ছেলে ছিল অনিরুদ্ধ···রবিবর্ম্মার ছবি আছে, ঊষার স্বপ্ন···পুরাণটুরাণগুলো পড়েছিস্ কখনো ?···জানিস্, সেই ঊষা ছিলেন এখানকার বাণ-রাজার মেয়ে ? অনিরুদ্ধর সঙ্গে ঊষার বিয়ে হয়েছিল পরে। ঊষার বাবা বাণ-রাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণর যুদ্ধ হয়েছিল ঐ তেজপুরে। তেজপুরের কাছে ছোট একটা পাহাড় আছে। সে পাহাড়ের নাম ঊষা-পাহাড়। আজো পাহাড়টার সেই নাম রয়ে গেছে! এ-সব হলো পুরাতত্ত্বের কথা। বাজে নাটক-নভেল ছেড়ে একটু-আধটু চর্চ্চা করিস দিকিনি!

একাগ্র মনোযোগে প্রকাশ আর হরেন এ-কাহিনী শুনিল।

প্রকাশ বলিল—কোথায় সেই দ্বারকা, এঁ্যা! সেখান থেকে এই আসামে অনিরুদ্ধ এসেছিল বাণ-রাজার মেয়ে ঊষাকে বিয়ে করতে!

প্রকাশ ডাকিল—হরেন···

হরেনের মনে ভারতের পৌরাণিক যুগ তখন বেশ খানিকটা আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে! হরেন ভাবিতেছিল···

প্রকাশের আহ্বানে তার চিন্তা-সূত্র কাটিয়া গেল। সে চাহিল প্রকাশের পানে।

প্রকাশ বলিল—তুমি তো হিষ্ট্রীর ষ্টুডেণ্ট···করো এবার ঐতিহাসিক পঙ্কোদ্ধার! বেশী নয়, শুধু এই আসামের তেজপুরে শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে বাণ-রাজার যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা সুরু করে দাও। তোমার জোগাড়-করা মশলা নিয়ে কলকাতার বাবু-কবির দল হয়তো এপিক্ রচনা করবে। আর বাঙলার সেক্স্পীয়র, ইবশেন্-নাট্যকারেরা সে-মশলা নিয়ে নাটক লিখতে সুরু করবে —'জয় তেজপুর-নাটক'···

হাসিয়া হরেন বলিল—একালের কবিরা এপিকে হাত দিয়ে

প্রতিভায় ঘূণ ধরায় না ! তারা লেখে দুর্ব্বোধ্য লিরিক···বস্তীর পচা আবহাওয়া আর যত সব ছাইপাঁশ নিয়ে !

একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, দেখি বটে ! ইলু এবার শ্বশুর-বাড়ী থেকে একরাশ মাসিক-পত্র এনেছে···সেদিন বসে বসে সেই সব মাসিকের পদ্য দেখছিলুম। দেখে গা শিউরে উঠলো ! একটা পদ্যর কটা লাইন এখনো মনে আছে। কবিতার নাম 'পাঁক'। লিখেছে—

কার্পেট গালিচা নিয়ে সৌখীনের দল
কত লেখালেখি করে। আর তুমি পাঁক,
দুর্গন্ধ গলিত পাঁক—পচা প্যাচ্‌পেচে···

পড়ে হাসি চেপে রাখা দায় !···ঐ নে প্রকাশ, সনাতন এসেছে জল নিয়ে। মুখ-হাত ধুয়ে নে।

বাল্‌তি ভরিয়া সনাতন জল এবং সাবান-তোয়ালে আনিয়া দিল।

প্রকাশ বলিল—নি···

সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এখন এক-কেটলি চায়ের জল চড়িয়ে দিতে পারবি বাবা···হ্যাঁ রে সনাতন ? এখন তো তোর রেলের ডিউটি নেই !

সনাতন বলিল—ষ্টোভ জ্বেলে পারবো বৈ কি।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—তাহলে দে বাবা। এ হলো প্রকাশ··· বুঝলি, আমার ভাগনে হয়। কলকাতা থেকে ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছেচে।···আর এটি প্রকাশের বন্ধু। তোমার কি নাম বাবা ?

সবিনয়ে হরেন বলিল—আজ্ঞে, আমার নাম হরেন।

বাল্‌তি-সাবান-তোয়ালে রাখিয়া সনাতন চলিয়া যাইতেছিল, নিরঞ্জনবাবু ডাকিলেন—সনাতন···

সনাতন ফিরিয়া চাহিল।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ওদের আর এখন ডাকিস্ নে। বাবুরা একটু বেড়াতে যাবেন, বলছেন। যাক্ বেড়াতে। তুই শুধু ঠাকুরকে ডেকে দে বাবা, দিয়ে ষ্টেশনে যা। ঠাকুর উঠে খাবার তৈরী করুক···হালুয়া, লুচি, ভাজা! আর বাবুদের জন্য সেই ভুটানী মেঠাই দিতে বলবি—বুঝলি? বজরঙ্গিবাবুর ওখান থেকে কাল সন্ধ্যার সময় যে-মেঠাই দিয়ে গেছে···বুঝতে পারলি তো?

সনাতন বলিল—বুঝেছি···

বলিয়া সনাতন চলিয়া গেল। নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—সনাতন হলো সিগ্নালার। এই অসুখে কম পরিচর্য্যা করছে! ওর জায়গা-জমি আছে। সিগ্নালার হলেও আমাদের উপর ওর খুব টান।

সুযোগ বুঝিয়া প্রকাশ বলিল—তোমার এ সনাতনটি বাঙালী?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না। ও এখানকার লোক। তবে ও কথাবার্ত্তায় বাঙালী হয়ে গেছে।···আমিনগাঁয়ের কাছে আছে হাজো···সেই হাজোয় সুনিবুনি পাহাড় আছে, ওর বাবা সেই পাহাড়ে কোটীদেবীর মন্দিরে পাণ্ডা ছিল।

প্রকাশ বলিল—পাণ্ডা!···ওরা বামুন?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না। গায়ের জোরে সে পাণ্ডা হয়েছিল। তারপর তার যে-কাহিনী···ওঃ, সে ঠিক তোদের নভেলের গল্প! এদেশের এদের কথা কেউ শোনে না। থাকতো আমাদের দেশে কোনান্ ডয়েলের মতো কোনো লিখিয়ে, তাহলে লিখতে পারতো। সে একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! শুনিস বরং ঐ সনাতনের মুখে! তোরা কলকাতার লোক, গাঁজা বলে' হয়তো উড়িয়ে দিবি। কিন্তু সত্যি ঘটনা রে!

বুজরুকি নয়, কল্পনার ভেল্‌কি-ফাঁকি নয়···শুনলে বুঝতে পারবি। সেক্সপীয়র কি শুধু শুধু অত-বড় কথাটা বলে গেছেন··· There are more things in Heaven and Earth....

নিরঞ্জনবাবুর এই কথার বাতাস দুই বন্ধুর চায়ের পেয়ালায় রোমান্সের চপল তরঙ্গ তুলিয়া দিল!

তিন

দু'তিন দিন পরে মামীমার অসুখ সারিলে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া প্রকাশ আর হরেন সনাতনকে ধরিয়া বসিল—তোমার বাবার কথা বলো সনাতন। মামাবাবু বলছিলেন, সে নাকি ভারী আশ্চর্য্য কাহিনী!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল—আপনারা সে-কথা বিশ্বাস করবেন না, বাবু...বলবেন, মুখ্যু-মানুষটা বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলছে!

হরেন বলিল—না, না, মামাবাবু বলেছেন, সত্যি। আমরা কেন মিথ্যা বলবো, সনাতন?

প্রকাশ বলিল—দুদিন তো তোমাকে দেখলুম সনাতন, তুমি মিথ্যাবাদী নও, তা বেশ জেনেছি। তুমি বলো তোমার বাবার গল্প।

সনাতন বলিল—মাষ্টার-বাবুর কাছে শুনলেন তো, আমার বাবা ছিল হাজোর হুনিবুনি মন্দিরের পাণ্ডা। বাবার গায়ে ছিল যেমন জোর, মনে তেমনি সাহস!...শিব-চতুর্দ্দশীর সময় হাজোয় মস্ত মেলা বসতো, বাবু। ওদিকে মণিপুর; আর-এদিকে নেপাল, সিকিম, ভুটান; আবার অন্যদিকে ধুবড়ি-গৌহাটী থেকে মেলায় একেবারে লাখে-লাখে যাত্রী আসতো। সেবারে ভুটানীরা করলে কি, শিব-চতুর্দ্দশীর সময় তারাও এক মেলা বসালো—জেলার ঘাঁটি আগলে। ওদের মুল্লুকে আছে গন্দা পাহাড়।

সেই পাহাড়ের কোলে ওদের মেলা বসলো। সে মেলায় খুব ধূম-ধাম! আমাদের এখানে যাত্রী এলো না। ওরা রটিয়ে দিলে, ছিন্নমস্তা দেবী স্বপ্নাদেশ দেছেন, এবার সুনিবুনিতে না বসে তিনি বসবেন গন্দা পাহাড়ে। ওদের দলে চাঁই ছিল একটা ভুটানী পুরুত—তার নাম কুন্দন।

শিবরাত্রির আগের দিন সন্ধ্যার পর বাবা চললো ওদের গন্দা পাহাড়ের দিকে। গিয়ে দেখে, পাহাড়ের নীচে ঘুটিং দিয়ে ওরা একটা মন্দির তৈরী করেছে; মন্দিরের সামনে একটা ঘর তুলেছে। ঘুটিং আর মাটী-লেপা ঘরের দেওয়াল—দেওয়ালে সাপের নক্সা এঁকেছে—ফণা-তোলা সব সাপ! আর বলির জন্য জোগাড় করেছে মস্ত একটা পাহাড়ী ছাগল, বড়-বড় কটা লাল মোরগ, কালো রঙের বারোটা মুর্গী, এক-ঝাঁক ঘুঘু আর পায়রা। এই সব ছাগল-মোরগ-পায়রার কাছে দশ-বারো বছরের ভুটানী একটা ছেলেকে এনে তারা বেঁধে রেখেছে!

ছেলেটিকে দেখে বাবার মায়া হলো। বাবা ভাবলে, এই ছেলেকে বলি দেবে? ইঃ, কি সব শয়তান!

পাহাড়ের চারিদিক ঘুরে-ঘুরে বাবা সব দেখে নিলে। দেখলে, বহু লোক জমেছে। মাথার উপর ঢাকা নেই। খোলা আকাশের নীচে সকলে পড়ে আছে—মদ-ভাঙ্ খাচ্ছে; আর মাদল পিটে কোথাও চলেছে নাচ্-গান, কোথাও বসেছে জুয়োর আড্ডা।

বলির জন্য ছেলেটাকে যেখানে ফেলে রেখেছে, সেখানে লোক-জন কেউ ছিল না। ঘুরে এসে বাবা দেখে, ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাবা ভাবলে, ছেলেটাকে নিয়ে আসবে—কেউ না জানতে পারে, এমন-ভাবে। কিন্তু তা করতে গেলে দেরী করতে

হয়! অনেক রাত অবধি! কেন না, এখন আমোদ-আহ্লাদ করলেও এরা যদি দেখে, বলির মানুষ চুরি হয়েছে, তাহলে ক্ষেপে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে! তাই বাবা করলে কি, ঐ যাত্রীদের দলে মিশে এদের কাছে খানিকক্ষণ, ওদের কাছে খানিকক্ষণ—এমনি করে সময় কাটাতে লাগলো।

এমনিভাবে দুপহর রাত কেটে গেল। যারা নেশা করছিল, তারা তখন প্রায় বেহুঁশ! আর যারা জুয়ো খেলছিল, তাদের মধ্যে যারা জিতেছে, তারা ঘুমোবার উদ্যোগ করছে।...বাবা দেখলে, ছেলেটির উপর কারো নজর নেই! ছেলেটিকে উদ্ধার করতে হলে এইটিই ঠিক সময়! নাহলে শেষ-রাত্রে উঠে এরা হৈ-হৈ-রবে পূজোর আয়োজন সুরু করবে আর ভোর হবার আগেই বলি শেষ হবে!

চারদিককার অবস্থা বুঝে বাবা ছেলেটার বাঁধন খুলে তাকে তুলে নিলে একেবারে পিঠের উপরে...

ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে বললে—আমাকে বলি দিতে নিয়ে চলেছো?

বাবা বললে, না। বাবা তাকে রক্ষা করবে। তাই সেখান থেকে তাকে নিয়ে একেবারে সুনিবুনি পাহাড়ে যাবে।

ছেলেটা বললে—আমার ছাগল? ওরা আমার ছাগল নিয়ে এসেছে। আমার ছাগল চাই!

বাবা তাকে অনেক বুঝুলো...বুঝুলো, ছাগল নিয়ে যেতে গেলে ওরা যদি জানতে পারে, তাহলে আর তাকে রক্ষা করা যাবে না!

ছেলেটি বললে, ছাগল না নিয়ে গেলে সে যাবে না। ওরা যদি ছাগলকে বলি দেয়, তাহলে তাকেও দিক বলি!

শেষে বাবা তাকে বললে—বেশ, আগে তোমাকে এদের

হাত থেকে নিয়ে যাই, তারপর ফিরে এসে তোমার ছাগল নিয়ে যাবো।

ছেলেটি বললে—সত্যি কথা বলছো ?

বাবা বললে—সত্যি কথা বলছি।

গল্পের স্রোতে বাধা দিয়া হরেন বলিল,—ছেলের সঙ্গে তোমার বাবার এ-কথা হয়েছিল, তুমি কি করে জানলে ?

সনাতন বলিল—এ-সব কথা বাবার মুখে শুনেছি। ছেলেটিকে নিয়ে এসে বাবা আমাদের হাতে দিলে। দেবার সময় যা-যা হয়েছিল, আমাদের সব বলেছিল কি না। মানে আমরা সকলে তখন আমাদের মন্দিরের দোরে জেগে বসে ছিলুম! এত-বড় একটা কাজে বাবা বেরিয়েছে···কি করে আসবে, আসতে পারবে কি-না, যদি কোনো বিপদ ঘটে, সেই সব ভেবে আমরা তখন অস্থির!

প্রকাশ বলিল—ও···তার পরে কি হলো, বলো···

সনাতন বলিতে লাগিল—ছেলেকে আমাদের কাছে রেখে বাবা আবার গেল তার ছাগল আনতে। বাবার পথ চেয়ে আমরা বসে রইলুম। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলুম। তার মনে কি আতঙ্ক! সে কেবলি বলে, না, পারবে না, ছাগল আনতে পারবে না! আমাকে আর ছাগলকে মন্ত্র পড়ে চান করিয়ে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে ওরা বেঁধে রেখেছিল! ওদের সে-মন্তরের ভারী জোর, আমি জানি সে-মন্তর পড়ে দিলে বলি যদি আকাশে, পাতালে বা সাগরে-পাহাড়ে থাকে, তাহলেও বলির সময় ডাক দেবা মাত্র সে-বলিকে হাড়-কাঠের কাছে চলে আসতে হবে!

ছেলের কথা শুনে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছিলো!

আমি বললুম—ও সব শোনা কথা। ও-কথার দাম নেই।

ছেলেটি বললে—দাম নেই, নয়। আমি জানি।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাবার সব চেষ্টা নিষ্ফল হলো! জোয়ারের জলের মতো ওদিকে রাত বেড়ে চলেছে। এখনি জোয়ার থেমে রাতের ভাঁটা সুরু হবে, আর সে-ভাঁটা শেষ হবার আগেই ঢোল-মাদল বাজিয়ে ওরা বলির পর্ব্ব সুরু করবে। গায়ে ক্ষণে-ক্ষণে কাঁটা দিতে লাগলো! কেবলি মনে হতে লাগলো, সর্ব্বনাশ, এখনি হয়তো ওদিকে বলির বাদ্য বেজে উঠবে! বাবা?…বাবা এখনো ফিরছে না কেন? ভয়ে আমরা একেবারে এতটুকু!

কথায় কথায় রাত্রি এগিয়ে চললো ভোরের দরজার দিকে…

রাত্রির সে-চলা চোখে যেন দেখতে পাচ্ছিলুম! যেন লম্বা একটা কালো ছায়া সরে-সরে চলেছে। চলেছে যেন অরুণ-লোকের পূব-তোরণের দিকে! সে-ছায়ার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা…মিস্-কালো দুখানা হাত বাড়িয়ে রাত্রি যেন পথের সন্ধান করতে করতে সামনে এগিয়ে চলেছে!…ঐ দুটো হাত দিয়ে ত্রয়োদশীর এই আঁধার-রাত অরুণ-লোকের তোরণে পৌঁছে যেমন আঘাত করবে, অমনি সেখানে সূর্য্যের ঘুম ভাঙ্গবে—আর সূর্য্যের সেই ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে…

গা শিউরে ছম্-ছম্ করতে লাগলো!

ছেলেটা অনেকক্ষণ চুপ-চাপ করে ছিল…দুটো চোখ সে বুজে ছিল! ভাবলুম, ভালোই হয়েছে…ঘুমোচ্ছে!

এ-কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি গর্জ্জন করে মাতন

তুললে! বললে—আমি যাবো…ঐ আমার ডাক এসেছে। ঐ ডাকে…আমায় ডাকে!

বলতে বলতে ধড়মড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে পাহাড় থেকে ছুটে নেমে যায়!

আমরা পাঁচ-সাতজন লোক জোর করে তাকে জাপ্টিয়ে ধরলুম। তবু তাকে ধরে রাখতে পারি না! তার গায়ে তখন যেন মহিষাস্থরের বিক্রম! কি জোর! তাকে আমরা টেনে পাহাড়ে তুলবো কি, সে আমাদের টেনে নিয়ে পাহাড়ের নীচে নামলো। নেমে থামতে চায় না, দাড়াতে চায় না…শুধু চলতে চায়! চলে—ছুটে চলে ঐ ভুটানী বস্তীর দিকে!

আমাদের সঙ্গে তার যেন যুদ্ধ চললো…মহাযুদ্ধ! এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না…কিন্তু আজো আমার মনে আছে, কি-জোরে আমাদের পাঁচ-সাতজন লোককে ঐ এক-রত্তি ছেলেটা টেনে নিয়ে চলেছিল। এই ছাখো বাবু, সে-কথা বল্‌তে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

কথাটা বলিয়া সনাতন তার দুই কণ্টকিত হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। হরেন আর প্রকাশ দেখিল, সনাতনের হাতের রোমরাজি কদম্ব-কেশরের মতো কণ্টকিত!

রুদ্ধ নিশ্বাসে হরেন বলিল—তারপর?

বিস্ফারিত-চোখে প্রকাশ বলিল—তোমার বাবা আর ফিরলো না, সনাতন?

একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সনাতন বলিল,—না!

তারপর সনাতন বলিতে লাগিল,—প্রায় এক ক্রোশ পথ ছেলেটা আমাদের ক'জনকে টেনে নিয়ে চললো। তার মুখে শুধু এক কথা—মায়ি-জী…মায়ি-জী…

তার টানে আমরাও চলেছি! চলেছি বললে ঠিক হবে না!

সে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে! এমন অবস্থা যে তাকে ছেড়ে দেবো, সে-কথা কারো মনে জাগছে না!···শুধু চলেছি! কোথায় চলেছি···শ্মশানে, না, মশানে,—খেয়াল নেই! ও আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে! কাটা গাছের গুঁড়িকে মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়, আমাদেরো যেন ও তেমনি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কাণে শুনলুম্ ঢাক-ঢোল-মাদলের অট্ট-রব!···দেহের সমস্ত হাড়গুলো সে-শব্দে কেঁপে ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো!···টানাটানি করতে করতে আমরা এলুম্ ভুটানীদের বস্তীর পাশে!

দেখি, সামনে পাহাড়। ঘুটিংয়ে গড়া ছোট্ট মন্দির। সেখানে ঐ বলির হাড়-কাঠ! দেখি, ভুটানীরা আমার বাবাকে ধরেছে ···বাবার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা···লাল টক্‌টক্ করছে···যেন দেবীর খর্পর-ঝরা টাটকা তাজা বলির রক্ত! বাবাকে ধরে তারা এগিয়ে চলেছে হাড়-কাঠের দিকে···

বাবা নিথর নিস্পন্দ! দেহে যেন প্রাণ নেই! বাবার আগে-আগে চলেছে মাথায় ইয়া-জটা-বাঁধা মোটা এক ভুটানী পুরুত!

পুরুত একটা মন্ত্র আওড়াচ্ছিলো···

আমাদের দেখে চারদিকে একটা হৈ-হৈ রব উঠলো। ভিড়ের মধ্য থেকে একরাশ লোক তেড়ে ছুটে এলো। আমাদের কাছ থেকে হিঁচড়ে টেনে ভুটানী ছেলেটাকে ছিনিয়ে সমস্বরে তারা চীৎকার সুরু করে দিলে!···আমরা হতভম্ব···যেন পাথরের পুতুল বনে গেছি!

হঠাৎ চোখের সামনে দেখি, রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে! সেই ভুটানী ছেলের দেহ থেকে মাথা গেছে খশে! আর তার

তরুণ নধর দেহ থেকে রক্ত ছুটেছে একেবারে ফিন্‌কি দিয়ে··· পাহাড়ের পাথর ফেটে অজস্রধারে যেমন জলের ধারা ঝরে, ঠিক তেমনি !

রক্ত দেখে মাথা কেমন ঝিম্‌ঝিমিয়ে এলো···চোখের সামনে দুনিয়ার আলো গেল নিবে !

আবার যখন আমরা আলোয় চোখ চাইলুম, তখন দেখি, কজনে আমরা মাটীতে লুটিয়ে পড়ে আছি ! ভুটানীদের পূজো শেষ হয়েছে···পাহাড়ের ওধারে বাজনা বাজছে ! এদিকে তাদের চিহ্ন নেই ! আর আমার বাবা···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সনাতন চুপ করিল। তার কপাল বহিয়া দর-দর ধারে ঘাম ঝরিতেছে···মুখে কথা নাই···মুখ যেন পাঁশুটে।

প্রকাশ ডাকিল—সনাতন···

সনাতন বলিল—বাবু···

যেন কোন্ পাতাল হইতে তার সে-স্বর আসিল !

হরেন বলিল—তোমার বাবা ?

কাশিয়া গলা সাফ করিয়া সনাতন বলিল—বাবা ওদের সেই হাড়-কাঠের কাছে পড়ে আছে—অজ্ঞান···অচেতন ! জল ঢেলে বাবার জ্ঞান করালুম। কিন্তু বাবার মুখে কথা নেই !

কোনোমতে বাবাকে নিয়ে ঘরে এলুম। তিন দিন, তিন রাত বাবার মুখে একটি কথা নেই ! শুধু ঘুম আর ঘুম ! ঘুম ভাঙ্গলে বাবা চারিদিকে চায়···পাগলের মতো থম্‌থমে ছম্‌ছমে দৃষ্টি !

তিন দিন, তিন রাত কাটবার পর চারদিনের দিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ বাবা বলে উঠলো—মায়ি-জী···মায়ি-জী···

বলে বাবা উঠে দাঁড়ালো। সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে তার

মুখে-চোখে যেমন ভাব হয়, বাবার মুখে-চোখে ঠিক তেমনি ভাব! যেন বাবার সামনে কে এসে দাঁড়িয়েছে···বাবা তাকে দেখে ভয়ে যেন শিউরে উঠেছে!

মুখে-চোখে সেই ভাব···বাবা চললো। কে যেন ডেকেছে, তার ডাকে! আমরা বাবাকে ডাকলুম। ধরলুম। বাবার চেতনা নেই! বাবাকে কিছুতে ধরে রাখতে পারলুম না! বাবা চললো···বাবার গায়ে অসুরের বিক্রম! সেই ছেলেটির দেহে যে-বিক্রম দেখেছিলুম, তেমনি বিক্রম! সে-বিক্রমের সঙ্গে যুঝতে পারলুম না! নিরুপায়ে আমরা বাবার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি!

চলে চলে সেই গন্দা পাহাড়! সেই ঘুটিংয়ের মন্দির!

মন্দিরে লোক নেই, জন নেই! শুধু ছিন্নমস্তা দেবীর একটি মূর্ত্তি! ভুটানীদের হাতে-গড়া মূর্ত্তি!

সেই মূর্ত্তির সামনে বাবা দাঁড়ালো। তারপর বিশ্বাস করবেন না বাবু, মূর্ত্তির হাত প্রসারিত হয়ে এলো···এসে বাবার চুলের ঝুঁটি ধরলে···ধরে টানতে লাগলো সেই মূর্ত্তির দিকে···ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে···

পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আমরা দেখলুম···নিশ্চল, নিস্পন্দ! কে যেন আমাদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে···কঠিন বাঁধনে!

তারপর চোখে পলক পড়লো! চেতনা এলো ফিরে! তখন দেখি, মূর্ত্তির হাতে বাবার পরণের কাপড়খানি মাত্র আছে। দেহের চিহ্ন নেই—একটা আঙুল পর্য্যন্ত নয়!

চার

কথাটা বলিয়া সনাতন চুপ করিল। হরেন এবং প্রকাশ—দুজনে স্তম্ভিত···যেন কাঠের দুটি পুতুল!

ঘণ্টাখানেক ক'জনে এমনি স্তম্ভিত ভাবে রহিল···

বেলা দশটা···

ষ্টেশনের ডিউটি সারিয়া নিরঞ্জনবাবু বাসায় ফিরিলেন। তিনজনকে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—সেই গল্প শোনা হচ্ছিল বুঝি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন বলিল—এ কি সত্যি কথা মামাবাবু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—সত্য-মিথ্যা জানিনা বাবা···তবে সেই অবধি মন্দির আর ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সনাতন কোনো সম্পর্ক রাখেনি। রেলের সাহেবদের ধরে-কয়ে রেলে চাকরি নেছে। আর সেই-ইস্তক এই রেলেই ও চাকরি করছে।

হরেন বসিয়া কি ভাবিতেছিল। সে বলিল—আচ্ছা মামাবাবু···

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—বলো···

হরেন বলিল—আপনি তো বরাবর এই অঞ্চলে আছেন?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আছি।

হরেন বলিল—আপনি নিজে কখনো অলৌকিক-কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন?

প্রকাশ বলিল—মানে, ভৌতিক ব্যাপার?

হরেন বলিল—ভূত নয়, মামাবাবু। ভূতুড়ে ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি না!

প্রকাশ কহিল—করো না? যেদিন প্রফেসর সেন ক্লাশে যে-ভৌতিক-ব্যাপারটি দেখেছেন বলে চালিয়ে দিলেন, সেদিন সে-গল্পের প্রতিবাদ-ছলে তো একটি কথা বলোনি! নিঃশব্দে সে-গল্প পরিপাক করেছো!

হরেন বলিল—সে তো ভূতের গল্প নয়···

প্রকাশ যেন কোমর বাঁধিয়াছে, এমনি ভঙ্গীতে বলিল—ভূত নয়, Spirit তো! ইংরাজীতে বললে বুঝি তার ভূতত্ব লোপ পায়? বিলিতি Spirit আর দেশী ভূত—দুয়ে তফাৎ কোথায়, বলো তো বাপু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—স্পিরিট নামানোর কথা শুনেছো বুঝি?

হরেন বলিল—হাঁ···মিডিয়ামের থ্রু দিয়ে মস্ত একটা ব্যাপারের সমাধান করেছিলেন তাঁরা। সেই কথাই প্রোফেসর সেন ক্লাশে আমাদের বলেছিলেন।

—সে কি গল্প, শুনি?

হরেন বলিল—প্রোফেসর সেনের একজন আত্মীয় ছিলেন—খুব ধনী। তিনি মারা যান। মারা গেলে তাঁর ডায়েরি থেকে জানা গেল, প্রায় বিশ হাজার টাকা তিনি ধার দিয়ে গেছেন। কাকে সে-টাকা ধার দিয়েছেন, তার কোনো সন্ধান মিলছিল না। তখন প্রোফেসর সেনের এক মামা-শ্বশুরকে তাঁর ছেলেরা ধরে বসলো। সেনের মামা-শ্বশুর একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট। ছেলেরা তাঁকে বললে, মিডিয়াম্-মারফৎ বাবার Spiritকে আনিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করুন, যদি কোনো সন্ধান মেলে। মামা-শ্বশুর তখন একদিন সিয়ান্স্ করলেন। সেই সিয়ান্সে

মিডিয়ামের দেহে ধনী ভদ্রলোকের স্পিরিট এসে ভর করলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, বেঁচে থাকতে বিশ হাজার টাকা যে ধার দিয়ে গেছেন, তার কাগজ-পত্র পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় সে কাগজ-পত্র? স্পিরিট তখন বলে দিলে, দেশে ওঁদের যে শেরেস্তা আছে, সেই শেরেস্তায় একটা নম্বুরি বাণ্ডিলের মধ্যে আছে সে টাকার লেনদেনের কাগজ-পত্র। ছেলেরা পরের দিন দেশে গিয়ে শেরেস্তাঁ খুঁজে সেই নম্বুরি বাণ্ডিল বার করলে, করে তার ভিতর থেকে বন্ধকী কাগজ-পত্র পেলে। জানি না, এর মধ্যে কতখানি সত্য, আর কতখানি পাবলিসিটির প্যাঁচ! প্রোফেসর সেনের এ-কথার প্রতিবাদ করতে গেলে বলতে হয়, আপনি মিথ্যাবাদী! তা তো করতে পারি না। তিনি হলেন প্রোফেসর আর আমরা তাঁর ছাত্র। তিনি খাতা দেখে এগ্‌জামিনের সময় নম্বর দেবেন!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না, না, কেন তিনি মিথ্যাবাদী হবেন? চোখে আমরা কতটুকু দেখি. বলো হরেন···মনেই বা কতটুকু প্রত্যক্ষ করি। যা আমরা চোখে দেখিনি, তাই নেই? না, তাই অবিশ্বাস করবো? তাছাড়া স্পিরিট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আগাগোড়া ভূয়ো বলে মনে করো না। এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। সে রহস্য বুঝতে হলে মনের যে-পরিমাণ শিক্ষা দরকার, আমাদের সকলের মনের সে শিক্ষা নেই! এই ধরো ম্যাথামেটিক্স! একজন দিব্যি গড়গড় করে শক্ত শক্ত প্রবলেম কষে যাচ্ছে, আবার আর-একজনের মাথায় তা ঢুকছে না! তেমনি ও-সব রহস্য বোঝবার শক্তিও সব মনের থাকে না! ভালো করে মনকে গড়ে তুললে তবে এ-সব তত্ত্ব বোঝবার মতো শক্তি জন্মায়।···আমি তাহলে তোমাদের একটি গল্প বলি, শোনো। ঐ ভুটানী-পাড়ার গল্প!

প্রকাশ বলিল—তুমি নিজে দেখেছো মামাবাবু ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এখন আমি সে-সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না। আগে তোমরা গল্পটি শোনো, তারপর যার যা মন চায়, আমাকে প্রশ্ন করো।

হরেন বলিল—বেশ, আপনি গল্প বলুন—আমি নিঃশব্দে বসে শুনবো।

প্রকাশ বলিল—আমিও কোনো কথা বলবো না মামাবাবু।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—চার বছর আগেকার কথা। আমি তখন গৌহাটিতে থাকি। গৌহাটিতে এক সাহেব ছিল—সাহেবের নাম ম্যাকার্মিক। সে ছিল জাতে স্কচ-ম্যান্। এই স্কচ ম্যাকার্মিক ছিল চা-বাগানের ম্যানেজার। একজন ভুটানী ছোকরা তার বাংলোয় কাজ করতো। ছোকরা খুব চালাক ছিল। ম্যাকার্মিক তাকে প্রশ্রয় দিত খুব। প্রশ্রয় পেয়ে সে একটু বিগড়ে গেল। সাহেবের এটা-ওটা সরাতে লাগলো। একদিন সাহেবের সদ্য-কেনা রূপোর সিগারেট-কেশ্ সরাতে সাহেবের সন্দেহ হলো। এবং ভুটানীটাও মালসমেত ধরা পড়ে গেল। সাহেব বললে—ফের যদি দেখি, হাতটান রোগ সারছে না, তাহলে দূর করে দেবো। ধরা পড়ে সাহেবের কাছে বকুনি খেয়ে ভুটানী দু'মাস ভালো হয়ে রইলো। তারপর···

ঠাকুর রামদীন আসিয়া গল্পস্রোতে বাধা দিল ; বলিল—চান করবেন না ? মা বক্ছেন···

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—দশ-পনেরো মিনিট পরে আমরা চান করতে যাচ্ছি, বলো গে ঠাকুর···

ঠাকুর চলিয়া গেল।

হরেন বলিল—তারপর ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—তারপর আবার সে যে-কে-সেই !

ভুটানীটা এবার মেম-সাহেবের জুয়েল-করা একটা হাত-ঘড়ি চুরি করে বসলো! জন্মদিনে মেম-সাহেবের মা তাঁকে এ-ঘড়ি পাঠিয়ে ছিলেন উপহার···গ্লাশগো থেকে! ভুটানীকে সন্দেহ করে মেম-সাহেব বললেন, ডাকো পুলিশ!. সাহেব বললে—এখানে আমিই পুলিশ, আমিই ম্যাজিষ্ট্রেট···

বলে' সাহেব তেড়ে গিয়ে ভুটানীর গলা টিপে ধরলো। ধরে তার পিঠে জুতোশুদ্ধ দমাদ্দম লাথি!

লাথির পর লাথি চললো। ভুটানী ছিট্‌কে পড়ে গেল। তার দাঁত ভেঙ্গে, নাক কেটে রক্তারক্তি ব্যাপার!···

রক্তারক্তি ব্যাপার দেখে মেমে-সাহেবের হলো ভয়। সাহেবের হাত ধরে মেম-সাহেব বললে—চলে এসো, আর নয় ···খুব সাজা হয়েছে! এনাফ্‌।

সাহেব বললে—ঘড়ি বার করে দিক্‌। নাহলে এমনি সাজা ওকে রোজ দেবো!

সাহেবের হুকুমে ভুটানীর ঘর-তল্লাসী হলো। ঘরের মধ্যে ছিল তার জুতো-জামা, রাজ্যের টুকিটাকি, আর সেই সঙ্গে তার দেবতার একটি মূর্ত্তি! পাথরে-গড়া মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি আমি দেখেছি—খানিকটা কালী-মূর্ত্তির মতো, খানিকটা আবার অন্য রকম। ভুটানীর ঘর থেকে মেম-সাহেবের হাত-ঘড়ি বেরুলো, আর বেরুলো সাহেবের একগাদা হারানো কলার, রুমাল, সার্ট, গেঞ্জি, মোজা। ভুটানীর উপর সাহেবের প্রহার-বর্ষণ চললো—বেদম প্রহার। মেম-সাহেবের সেদিকে দৃষ্টি নেই। তাঁর হাতে সেই পাথরে-গড়া দেবী-মূর্ত্তি···মেম-সাহেব সেই মূর্ত্তিটি হাতে নিয়ে একাগ্র-মনে একাগ্র-দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছেন! সেই ঠাকুরের মূর্ত্তির উপর মেম-সাহেবের মনে জাগলো লোভ! মেম-সাহেব বললেন—ফাইন্‌ পীশ্‌···কিউরিয়ো···আই কীপ্‌

হরেন ডাকিল—বন্ধু,…ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস্

ইট্! এ-কথা বলে মেম-সাহেব সেটি নিয়ে চলে আস্ছিলেন। ভুটানী অত মার খেয়েও মেম-সাহেবকে ছাড়লো না। মেম-সাহেবকে সে বললে—নোকরি লাও মেম-সাহেব, পুলিশে দাও …তা বলে আমার দেওতা লিবে না!

মেম-সাহেব বললে—এর জন্য একঠো রূপেয়া…

ভুটানী বললে—রূপেয়ায় দেওতা দেওয়া চলবে না মেম-সাব…দেওতা রোখে দাও।

সাহেব হেসে উঠলো। হো-হো হাসি! মেম-সাহেব নিঃশব্দে ভুটানীর সেই দেবতার মূর্ত্তি নিয়ে চলে গেল। তারপর…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরঞ্জনবাবু চুপ করিলেন, বলিলেন—তারপর কি হলো বলতে পারো তোমরা?

হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ! হরেন বলিল—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মেম-সাহেব মরে গেল?

প্রকাশ বলিল—রাত্রে ভুটানী এসে সাহেবকে আর মেমকে খুন করে গেল?

মাথা নাড়িয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না।

প্রকাশ ও হরেন সমস্বরে বলিল—তবে?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—রাত প্রায় দুটো…মেম-সাহেব আর সাহেব দুজনে ঘুমোচ্ছে…গাঢ় ঘুম! হঠাৎ মেঘ ডাকলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ! সে-শব্দে শুধু সাহেব আর মেম নয়—বাড়ীর চাকর-বাকর সকলে জেগে উঠলো! জেগে তারা আকাশের পানে চাইলো! আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। আকাশে ধপ্ধপে চক্‌চকে এক-ফালি চাঁদ—অসংখ্য নক্ষত্র…মেঘ ডাকে কি করে? অবাক হয়ে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে…ওদিকে ঘুম ভেঙ্গে মেম-সাহেব দেখে, তার মাথার শিয়রে খর্পর

খড়গধারিণী কালী-মূর্ত্তি! মূর্ত্তি জীবন্ত! কালো কষ্টি-পাথরে খোদা মূর্ত্তি···মূর্ত্তির দু' চোখে আগুন জ্বলছে!

মেম-সাহেব চীৎকার করে' উঠলো! সাহেবও চীৎকার ক'রে উঠলো! সে চীৎকার শুনে দুজন বেয়ারা ছুটে এলো। সাহেবের ঘরে ঢুকে তারা দেখে, সাহেব আর মেম যেন পাথর হয়ে গেছে! তাদের মুখে কথা নেই, চোখে পলক পড়ে না!··· অথচ কেন? ঘরের মধ্যে কেউ নেই!

প্রকাশ বলিল—তারপর?

রুদ্ধ নিশ্বাসে অবিচল নেত্রে হরেন চাহিয়া রহিল নিরঞ্জন-বাবুর পানে।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—দুজনের দেহ কাঠের মতো শক্ত! বেয়ারারা তখনি ডাক্তার-সাহেবকে খপর দিলে। ডাক্তার-সাহেব এলেন।

নানা চিকিৎসা হলো। সাহেব-মেমের জ্ঞান আর হয় না! অথচ মৃত্যু নয়! নাড়ী চলেছে, নাকে নিশ্বাস! গা ফুঁড়ে ওষুধ-পথ্যি খাওয়ানো চললো! প্রায় পনের দিন পরে দুজনের জ্ঞান হলো। মেম-সাহেব কিন্তু পাগল হয়ে গেল! সাহেব পাগল হয়নি, তার দুটি হাত বাতে একেবারে পঙ্গু হলো···হাত নড়ে না, চড়ে না।···সাহেব এ-কথা সকলের কাছে বলেছিল, আমিও সাহেবের নিজের মুখে এ-কথা শুনেছি।

কাহিনী শুনিয়া হরেন বলিল—এটা আমি মানি যে কারো ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বা কারো দেবদেবীকে তাচ্ছল্য বা ঘৃণা করতে নেই! এর আধ্যাত্মিক মর্ম্ম কি, তা জানি না! তবে মানুষের সবচেয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস তার ঠাকুর-দেবতার উপর,—কাজেই কারো মনের সে-জায়গায় আঘাত দিলে তার ফল কখনো ভালো হতে পারে না! শুনতে পাই, ঐতিহাসিক-

যুগের কালাপাহাড়কেও শেষ-জীবনে বহু শাস্তি পেতে হয়েছিল !

প্রকাশ বলিল—তাহলে তুমি বলতে চাও মামাবাবু, অসভ্য জাতেরা ঐ যে মানুষকে আর পশুকে ধরে বলি ছায়, সেগুলোর সমর্থন করতে হবে ? বলি দিয়ে যে তারা দেবতার তুষ্টি-সাধন করে, সে বলি বন্ধ করলে তাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগবে ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—বলি বন্ধ করতে হয়, যুক্তি দিয়ে করো। গায়ের জোরে প্রভুত্বের দর্পে বা ভয় দেখিয়ে বলি বন্ধ করা উচিত হবে না। তাছাড়া পূজোর আচার-রীতির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাদের না থাকুক, সে আচার-রীতিতে পৈশাচিকতা দেখলে তার উচ্ছেদ করতে পারো ! তা বলে দেবতার বিগ্রহ বা মূর্ত্তি নিয়ে তার অপমান করা···আমি খুব পণ্ডিত-মানুষ নই প্রকাশ, কিন্তু আমার মন তাতে ভয়ে সঙ্কুচিত হয় এ-কথা অস্বীকার করছি না !

প্রকাশ বলিল—তুমি তাহলে বলতে চাও, বুনো কোল-ভিলদের বা এই সব পাহাড়ী ভুটানী-খাশিয়াদের বিগ্রহ দেখলে তাদেরও প্রণাম ঠুকতে হবে ?

হরেন বলিল—প্রণাম না ঠোকো, সে-বিগ্রহকে তামাসা করবার বা জুতোর ঠোকর মারবার কোনো অধিকার তোমার-আমার নেই !

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ঠিক কথা···

ঠাকুর আবার আসিয়া তাড়া দিল, বলিল—মা-ঠাকরুণ খুব রাগ করছেন। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে বাবু···

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না ঠাকুর, আমাদের কথা শেষ হয়েছে। আমরা এবার উঠছি···

প্রকাশ হাসিল, হাসিয়া বলিল—তোর খিদে পেয়েছে হরেন···বুঝেছি। এতখানি ঘুরে এলি···খালি-পেটে কি না। তা মাভৈঃ! এখনি লুচি আসছে আর সেই সঙ্গে ভুটানের চাক-ভাঙ্গা টাট্‌কা মধু। সে মধু দিয়ে গরম-গরম লুচি খা···ফার্ষ্ট ক্লাশ···এমন কখনো খাস্‌নে!

হরেন চুপ করিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

স্টেশনের বাহিরে মস্ত একটা শিশু গাছ। তার মাথা টপ্‌কাইয়া আকাশে ঐ চাঁদ! চাঁদের জ্যোৎস্না গাছের নিবিড় শাখাপত্রের রন্ধ্রান্তরাল দিয়া পথে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আলোয় কেবলি স্বপ্নময়তা! সত্যের সঙ্গে কল্পনার আবছা মিশিয়া মনকে উতল করিয়া তোলে!

সিগ্‌নালার সনাতন আসিল। তার হাতে প্লেট। প্লেটে গরম লুচি আর চীনা-মাটির বাটীতে মধু।

প্রকাশ ডাকিল—হে ধ্যানী-বুদ্ধ, ধ্যান ভঙ্গ করো! তোমার অর্ঘ্য এসেছে।

হরেন ফিরিয়া চাহিল···কোনো কথা বলিল না।

প্রকাশ বলিল—মাসীমা পাঠিয়েছেন। বৈরাগ্য-বশে যদি গৃহ-ত্যাগ করো, তার আগে এই লুচি আর মধু খেয়ে নাও। ভুটানী মধু। এ মধুতে প্রাণ-সঞ্জীবনী শক্তি আছে, বন্ধু।

হরেন জবাব না দিয়া সনাতনের পানে চাহিল, বলিল—এক-বাল্‌তি জল আনো তো সনাতন। মুখ-হাত ধোবো।

টেবিলের উপর প্লেট রাখিয়া সনাতন জল আনিয়া দিল।

মুখ-হাত ধুইয়া হরেন প্লেট টানিয়া আহারে মনঃসংযোগ করিল।

খাইতে খাইতে হরেন ডাকিল—সনাতন...

সনাতন বলিল—বাবু...

হরেন বলিল—তোমাদের হাজো-পাহাড়ের ওদিকে যে ভুটানীরা থাকে, তারা খুব বুনো ?

সনাতন বলিল—আমরা তাদের বুনো বলি না, বাবু। আমরা বলি, পাহাড়ী।

হরেন বলিল—তারা খুব ঠাকুর দেবতা মানে ?

সনাতন বলিল—তারা কি মানে, আর কি মানে না বলা শক্ত, বাবু।

হরেন বলিল—তার মানে ?

সনাতন বলিল—বাবা ওদের বলি কেড়ে এনেছিল, তাই বাবার উপর তাদের অত রাগ ! অথচ ওদের মধ্যে দলাদলি হলে এক-দলের বলি অপরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাতে কিন্তু ওদের ভয় করে না যে দেবতা রাগ করবে, আর রাগ করলে দেবতার শাপ-মন্যিতে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে !

প্রকাশ বলিল—আরে আহাম্মক, এরা হলো অসভ্য জাত। এরা এখনো প্রিমিটিভ্ রয়ে গেছে। এদের পূজো-পার্ব্বণ আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তুই কি এমন গবেষণা করবি যে তোর বরাতে নোবেল-প্রাইজ জুটে যাবে, বলতে পারিস ?

হরেন বলিল—তুই বুঝচিস্ না প্রকাশ ; মিছে কথা-কাটাকাটি করিস্ নে। জানিস, ধর্ম্ম-বিশ্বাস জিনিষটা কি ? এই ধর্ম্মকে কল্পনা করে' এতে বিশ্বাস রেখে মানুষ নিজের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক গড়ে নেয়। এই গড়ে নেওয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্মৃষ্টি করে' দরকার-মতো সে-বিশ্বাসে কেউ পায় শক্তি, কেউ পায় সান্ত্বনা ! একটা-না-একটা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে মনকে বাঁধতে না পারলে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করা কাজ-

কর্ম্ম করা···এক-কথায় আশা-নৈরাশ্য নিয়ে বেঁচে থাকা শক্ত হতো!

প্রকাশ বলিল—কি যে তুই বলিস্ হরেন! এর জন্যই তুই লেখাপড়া শিখছিস! এবারে না গ্র্যাজুয়েট হবি!··· নোড়ানুড়ি আর কুমোরটুলির কুমোরের-গড়া মাটীর মূর্ত্তির উপর নির্ভর করে তুই জগতে দাঁড়াতে চাস? ঐ মূর্ত্তি তোকে দেবে শক্তি? তোকে দেবে সান্ত্বনা? ধেৎ!

হরেন বলিল—তুই উল্‌টো তর্ক করছিস! কুমোরের গড়া মূর্ত্তিটাই সব নয়। যে-কল্পনা নিয়ে কুমোর ও-মূর্ত্তি গড়ছে, যে-রীতি মেনে—সেই কল্পনা আর রীতিকে আমি মানছি!··· তাছাড়া জানিস, তোর আলডুস হক্সলির মতো অতি-আধুনিক দার্শনিকও বলেছেন, ভক্তি-মার্গ ভালো: তাতে করে' খুব শীগগির মানুষ তার কাজে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।···তাছাড়া মনের শক্তি কত, তার আইডিয়া তোর আছে? এই মন কত-খানি জোর পায় ঐ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে—তা এখন না বুঝলেও একদিন বুঝবি, প্রকাশ। পুরাণের গল্প মনে আছে? ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনছিলেন, গায়ের জ্বালায় অনেকে তখন গঙ্গার গতি রোধ করতে গিয়েছিল, রোধ করতে পারেনি! বিরাট দেহ আর সে-দেহে বিপুল শক্তি নিয়ে ভোঁদা ঐরাবতও গিয়েছিল। কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে ঐরাবত ভেসে গেছলো! গল্প বলে' যদি এ-কথা উড়িয়ে দিতে চাস, তাহলেও এ-গল্পের যে সার-মর্ম্ম, তা হচ্ছে এই যে, উইল্-পাওয়ারের চেয়ে বড় শক্তি আর নেই! তোর চেয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিতের দলও নাস্তিকতা প্রচার করতে কশুর করেনি, তবু সেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমান-ধারায় বয়ে আসছে!

ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া প্রকাশ বলিল—আমি প্রতিজ্ঞা

করছি হরেন, তোর যা খুশী তুই কর, আমি তাতে স্পীকৃটি-নট্‌! চিরদিন তুই ইমোশনাল্‌···কোনো যুক্তি তুই শুনবি না, আমি জানি।

কথাটা বলিয়া প্রকাশ খপরের কাগজ খুলিয়া বসিল।

হরেন চাহিল সনাতনের পানে, কহিল—তুমি ওদের পাহাড়ের দিকে আর কখনো যাওনি সনাতন?

সনাতন বলিল—না বাবু।

—ওদিকে কি আছে?

সনাতন বলিল—ভুটানীরা আছে। পাহাড়ের ওধারে খানিক এগিয়ে যারা থাকে, শুনেছি, তারা আশ্চয্যি রকমের মানুষ, বাবু। এদিককার কোনো খপর তারা রাখে না। তাদের ধরণ-ধারণ আজো রয়ে গেছে সেই আদ্যিকালের মতো।

হরেন বলিল—সে কি রকম ধরণ, সনাতন?

সনাতন বলিল—তা আমি জানি না। তবে গল্প-কথা শুনি কিনা, তাই বলছিলুম।

—গল্প-কথা! তার মানে?

সনাতন বলিল—তারা অন্য দেশের লোককে সহ্য করতে পারে না। ভাবে, তাদের দেশ লুঠ করতে এসেছে, তাদের দেশে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেবে, তাদের দেশে দুঃখ-কষ্ট দিতে এসেছে!

হরেন বলিল—ওরা খুব সুখে আছে? টাকা-কড়ি, খাবার-দাবার—এ-সবের অভাব জানে না?

সনাতন কহিল—না বাবু, টাকা ওরা কোথায় তেমন পাবে? ওদের দেশ ছাড়া অন্য-সব দেশের লোককে ওরা সন্দেহ করে—মোটে বিশ্বাস করে না!

প্রকাশ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—তত্ত্ব-কথা

পরে হলে চলে না ? লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে ! খেয়েদেয়ে সনাতনের মুখে আজগুবি গল্প শুনো···

এ-কথায় হরেন নিঃশব্দে আহারে মন দিল। তারপর আহার শেষ হইলে হাত-মুখ ধুইয়া বলিল—হাঁটা-পথে ওদিকে যাওয়া যায় ?

সনাতন যেন শিহরিয়া উঠিল ! কহিল,—আপনি যাবেন না কি বাবু ?

হরেন বলিল—যাবো না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি !

সনাতন কহিল—হেঁটে মানুষ কতটুকু যাবে ? ওরা অমন জোয়ান্ পাহাড়ী···ওরাই পারে না ! ভুটানী ঘোড়া ওদের সম্বল। এখানেও ভুটানী-ঘোড়া মেলে। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওরা যাতায়াত করে। পাহাড়ে কখনো খুব চড়াই উঠতে হয়—কখনো আবার অমন হাজার দু'হাজার ফুট নীচে নামতে হয়। ভুটানী-ঘোড়ার কড়া জান, পাহাড়ে চলার তাক্‌তুক্ তারা জানে।

কথাগুলা বলিতে বলিতে প্লেট-বাটি গোছ করিয়া তুলিয়া সনাতন চলিয়া গেল।

হরেন আবার ইজিচেয়ারে পড়িয়া চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিল।

মন কেবলি তাকে খোঁচা দিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, এই তো এতদিন কলিকাতার মতো জবর সহরে দিন কাটাইলে ! কি পাইয়াছ ? জীবনের এতগুলা বছর শুধু রুটিনের নিগড় মানিয়া চলিয়াছ ! যতই এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াও—ছিলে তো খাঁচার মধ্যে পাখীর মতো বন্দী ! ভগবান হাত-পা দিয়াছেন, সে কি এক-জায়গায় বন্দী থাকিবার জন্য ? বিধাতার তৈরী

এত-বড় পৃথিবী! সৌখীন-ধনী না হইলে বুঝি সে-পৃথিবী দেখা যায় না? বেড়াইতে গেলে চাই অন্ততঃ-পক্ষে ট্রেনের সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরা—তার সঙ্গে বেয়ারা-খানশামা আর পাহাড়-প্রমাণ লগেজপত্র! এত তোড়জোড় লইয়া কতদূর যাও? তার চেয়ে চাহিয়া ছাখো ঐ সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে! লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাঁরা হিমালয় হইতে কেপ-কমোরিন্ পর্য্যন্ত কেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! এই বয়সে এত আরাম চাহিলে দেহে কি আর পদার্থ থাকিবে? অম্বল, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় দেহখানি হইবে রোগের ডিপো! শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে—শক্তি-সামর্থ্যের উপর কত টাকা চাই? এই যে আমেরিকা হইতে ফ্রান্স হইতে হাঁটিয়া ওদিককার লোক পৃথিবী-পর্য্যটনে বাহির হয়!...তাদের মতো হাত-পা চালাইয়া বাহির হইয়া পড়ো দিকিন! কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় চড়িবার জন্য কোন্ তেপান্তরের পার হইতে মানুষ আসিতেছে...তোমার মতো এ-সব মানুষেরও দু'হাত, দুই পা...তোমার চেয়ে বেশী হাত-পা দিয়া ভগবান তাদের পৃথিবীতে পাঠান নাই! অথচ তারা...আর তোমার বাড়ীর পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা! তোমার মন কেন ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য অধীর হয় না? পাশ করিয়া পয়সা-উপার্জ্জন? সে তো সকলে করিতেছে! তাহাতে কি সুখ? তার চেয়ে...

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল।

> ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—
> চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

মন বলিল, ওঠো হরেন্দ্র, ভুটান হইতে ডাক আসিয়াছে! আর বাড়ী ফিরিয়ো না! পিছনে তাকাইয়া আবার সেই থোড়-বড়ি-খাড়া...আর খাড়া-বড়ি-থোড়? না, তার চেয়ে সামনে চলো! সাম্‌নে বিরাট পৃথিবী মুক্ত, অবারিত

তার তোরণ-দ্বার! এখান হইতে উত্তরে ঐ ভুটান···তার আরো-উত্তরে হিমালয়! তারো উত্তরে চীন, মোঙ্গোলিয়া, রাশিয়া···

ঐ পাহাড়ের উপর দিয়া একদিন চীন হইতে আসিয়াছিলেন হিউয়েন্‌থ্‌-সঙ্‌। আজ তুমি চলো ভারতবর্ষ হইতে সেই হিউয়েন্‌থ্‌-সঙের দেশে! তুমি মানুষ। মানুষ যাহা করিয়া গিয়াছে, তুমি কেন তা করিতে পারিবে না?

ঐ পাহাড়! ছেলেবেলায় জিওগ্রাফি পড়িয়া ম্যাপ দেখিতে, কতকগুলা কালির হিজিবিজি! সে হিজিবিজির পর আবার মা-ধরিত্রীর শ্যামল স্নেহাঞ্চল!

বাড়ীতে মা-বাবা, দাদা-দিদি, ছোট ভাই সুরেন···?

মন বলিল, তারা আরামে আছে, আরামে থাকিবে! তোমার অদর্শন?···আজ যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাঁদেরো মৃত্যু হইবে?···তবে?

তুমি তবু মরিতে যাইতেছ না! যদি এদিককার পৃথিবী দেখিয়া ফিরিতে পারো, তাহা হইলে সেদিনের সে-আনন্দ··· বিজয়-উৎসবের সে-সমারোহ!

সারা রাত হরেনের চোখে ঘুম নাই! সে যেন সনাতনের বাবার কাহিনীর সেই ভুটানী-বালকের মতো কার ডাক শুনিতেছে!

কে ডাকে···ডাকে!

হরেন বলিল—যাই মায়ি···যাই মায়ি-জী!

এ মা···ধরিত্রী-দেবী!

এমন করিয়া ধরিত্রী-মায়ের ডাক আর কেহ শুনিয়াছে?

না!

হরেনের দেহ-মন বহিয়া পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া গেল! সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন! আর তার স্বপ্নাতুর মনের সামনে···সাগরাম্বরা ধরিত্রী-মায়ের বিরাট মূর্ত্তি!

পরের দিন ভালো করিয়া ভোরের আলো ফুটিবার পূর্ব্বেই ছোট এক-টুকরা কাগজ লইয়া সেই কাগজে হরেন চিঠি লিখিল। লিখিল,

ভাই প্রকাশ,

আমাকে ক্ষমা করিস্। এখানে এসে আমি যেন সারা পৃথিবীর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। ফিরে আবার সেই কলকাতার কলেজ আর কলেজে পার্সেণ্টেজ রাখা—ওতে আর আমার এত-টুকু রুচি নেই!

প্রগতির যুগে সকলে অগ্রসর হয়ে চলেছে—আমিও অগ্রসর হয়ে চললুম।

কোথায়, জানি না।

যদি কোনোদিন ফিরি, জানিস, সিদ্ধার্থের মতো ফিরবো··· বুদ্ধ হয়ে!

আমার ভালোবাসা নিস। মামাবাবুকে, মামীমাকে আমার প্রণাম দিস।

আমার সন্ধান করিস্ নে। সন্ধান পাবি না!

তার কারণ, আমি নিজে জানি না কোথায় চলেছি, কোন্ পথে!

এ পথে আমার গাইড্ আমার মন আর আমার এই দুই চোখ।

তোর—

হরেন

বাড়ীর অদূরে ভুটানীদের আস্তানা। দশ টাকা দাম দিয়া একটা তেজী ভুটানী ঘোড়া কিনিয়া হরেন তার পিঠে

চড়িয়া বসিল। একদিন স্পোর্টসে পটুতা ছিল; তার জোরে ঘোড়ার পিঠে চড়িতে তার মনে এতটুকু দ্বিধা জাগিল না।

পয়সা-কড়ি যা ছিল, সঙ্গে লইয়াছে। আহার চাই। নহিলে যাত্রা নিষ্ফল।

মন বলিল—যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই পথে আহার জোগাইবেন!

হরেন নিজে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল, নিজের উপর তার এ-নির্ভরতা, ভগবানের উপর এমন বিশ্বাস এতদিন তার কোথায় ছিল!

ছয়

ভুটানী টাট্টুর পিঠে চড়িয়া হরেন চলিয়াছে। রেল-লাইনের উল্টা দিকে। যেদিকে পাহাড়ে-পাহাড়ে আড়াল তুলিয়া এদিককার পৃথিবীকে ওদিককার পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই অজানা দিকে চলিল।

মনের মধ্যে ইতিহাসের সেকন্দর শাহ আসিয়া দেখা দিল! বলিল, এই তো চাই! জোয়ান ছেলে! মাটির পুতুল হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে কি? আমার মতো এমনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়ো।

সেকন্দার শাহ, চেঙ্গিজ খান, তৈমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ন, কলম্বাশ, ন্যানশেন—সকলে আসিয়া মনের সামনে উদয় হইতে লাগিল। সকলে তার কাণে শুনাইল আশার বাণী—অন্ওয়ার্ড মার্চ্চ···অন্ওয়ার্ড! ভয় নাই মাই বয়!

গর্ব্বে হরেনের বুক দুলিয়া উঠিল। সে যে আর পাঁচজন-বাঙালী-ছেলের মতো নয়, সে যে আজ অসাধ্য-সাধনের ব্রত-পালনে বাহির হইয়াছে···ইহাতেও কি আনন্দ! কি গর্ব্ব!

মাইল-খানেক পথ চলিবার পর পথ ফুরাইয়া গেল। এবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে।

পাহাড়ের গায়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সর্পিল ভঙ্গীতে সরু পথরেখা। ঘোড়া নিজে সেই পথরেখা ধরিয়া চলিল। ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে এ রেখা চলিয়াছে···ঘোড়াও সে-রেখায় পা ফেলিয়া সমানে ঊর্দ্ধে চলিয়াছে।

পাহাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝে কল-কল্লোল! গায়ে রোমাঞ্চ ···হরেন ভাবিল, সে কি গন্ধর্ব্ব-লোকের কাছ দিয়া চলিয়াছে? নহিলে এমন অপরূপ সুরে জল-তরঙ্গ বাজনা বাজায় কে?···

অগ্রসর হইয়া হরেন দেখে, গন্ধর্ব্ব-কন্যাদের জল-তরঙ্গ নয়; পাহাড় কাটিয়া অজগরের দেহের মতো মোটা-তোড়ে জল-ধারা নিঃসারিত হইতেছে।

এ জল গিয়া পড়িতেছে নীচে···দু' হাজার, চার হাজার ফুট নীচে কোন্ অতল ভূ-তলে!

পাহাড়ের দেহে সবুজ ঘাস, তৃণগুল্ম-তরু···পাহাড়ের কঠিন দেহকে তারা সবুজে-শ্যামলে রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

পিপাসায় কণ্ঠ অধীর। এক-জায়গায় ঘোড়া হইতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া হরেন নির্ঝরের জল পান করিল।

জল পান করিয়া আরাম পাইল। পাহাড়ের কোলে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিল,···গভীর খদ্···পাহাড়ের পাথরে-পাথরে অতিকায় সোপানশ্রেণী······মাঠ-জলা-প্রান্তর। দূরে প্রান্তর-পথে খাকী-শর্ট-সার্ট পরা আরো ক'জন মানুষ···ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া কোথায় যেন চলিয়াছে···তাদের হাতে দুরবীন্··· পিঠে গোঁজা সঙ্গীন-বন্দুক······রৌদ্র-রশ্মিতে সঙ্গীন্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে···বিদ্যুতের রশ্মির মতো!

খানিক-ক্ষণ চারিদিককার দৃশ্য-মাধুরী উপভোগ করিয়া আবার সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল।

ঘোড়া চলিয়াছে···চলিয়াছে···

চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। উৎরাইয়ে ছোট ছোট ভুটানী বস্তী। মেয়েরা সকালে উঠিয়া কাজে লাগিয়াছে।

···বাবার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে লাগলো···

…বস্তীর চাল ফুঁড়িয়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পাহাড়ী ছাগল লইয়া ভুটানী-মেয়ে পাহাড়-পথে বাহির হইয়াছে।

দু'চারজন মেয়ে তার পানে চাহিয়া দেখিল। অলস দৃষ্টি। সে-দৃষ্টিতে এতটুকু কৌতূহল নাই!

তারপর চলিতে চলিতে পাহাড়ের প্রাচীরের ও-সব বস্তী ছায়ার মতো কখনো মিলাইয়া যায়, কখনো আকাশের মেঘ-খণ্ডের মতো মাথার উপরে দু-চারিটা বস্তী আবার জাগিয়া ওঠে! কোথাও বা বস্তীর চিহ্ন নাই…শুধু পাহাড়ের পাথরে-পাথরে ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে—যেন মৌন-মূক দৈত্যের দল! তাকে দেখিয়া কি-মতলব আঁটিতেছে! তারপর আবার বস্তী! সেখানে মানুষ-জন…তাদের গুঞ্জন-রব কাণে ভাসিয়া লাগিল! মনে হইল, ও যেন মধুকরের গুঞ্জন!

কোথাও ঝোপ-ঝাপ। সে সব ঝোপে লাল, নীল, বেগুনি, সাদা…নানা রঙের ফুল। অজস্র ফুল। গাছে গাছে কত রকমের পাখী! এই প্রভাতে পাখীরা কল-গান তুলিয়া দিয়াছে…যেন পাহাড়ের দরাজ-বুকে তারা জলসা বসাইয়াছে!

চলিতে চলিতে খর বেশ ধরিয়া প্রভাত-সূর্য্য মাথার উপর তীব্র জ্বলন্ত হইয়া উঠিল! তার জ্বলন্ত কিরণে গায়ে তীব্র জ্বালা!

বাঁকা-পথে ঘোড়া পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। অদূরে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর। মাথার উপর পাহাড়ের শিরে রজত-তুষারের কিরীটিমালা। নীচে প্রসারিত প্রান্তরে যেন সবুজ রঙের সাগর। বাতাসে গাছপালা দুলিতেছে, কাঁপিতেছে… পাহাড়ের বুকে সবুজ-রঙের ঢেউয়ের লীলাখেলা!

বৈকালে পিপাসায় কণ্ঠতালু জ্বালা করিতে লাগিল! ছোট নদী। নদীর জল তুষার-শীতল।

হরেন নামিয়া নদীর জল পান করিল। জলের বুক ভরিয়া রাশি-রাশি পাণিফল।

হরেনের বুক আশার রঙে উচ্ছ্বসিত হইল। ভাবিল, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই এ নিরালা-নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে সাজাইয়া রাখিয়াছেন ক্ষুধাতুরের জন্য রসালো-মিস্ট এই পাণিফল!

পাণিফল তুলিয়া হরেন খাইতে বসিল। বড় বড় ফল। ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিল। প্রান্তরের বুকে প্রচুর তৃণ-শস্য। ঘোড়া সে-তৃণশস্যে তার ক্ষুধা-নিবারণ করিল।

পশ্চিম-আকাশে আবীর গুলিয়া সূর্য্য এবার অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। দূরে আবার ঐ বস্তী দেখা যায়…

হরেন ভাবিল, রাত্রির মতো ঐ বস্তীতে বিশ্রাম! তার পর কাল সকালে আবার যাত্রা।

বস্তীতে আসিয়া ভাবিল, না, আকাশ-তলে বিশ্রাম করিব। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, আবার ঘরের উপর লোভ!

মনে হইল, এ পথের পর ঘর যদি আর না পাই? মাথার উপর আকাশের আচ্ছাদন…আচ্ছাদন-তলে বাস অভ্যাস করিয়া লই। মানুষ যেদিন প্রথম ধরণীর বুকে আসিয়াছিল, সেদিন তার মাথার উপরে চালা ছিল না, ছাদ ছিল না…ছিল শুধু নীল-নির্ম্মল আকাশ!

সঙ্গে ছিল কম্বল। সেই কম্বলে গা ঢাকিয়া পাহাড়ের কোলে হরেন পড়িয়া রহিল। ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিল।

তার পর কখন রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে জানে না!

পরের দিন সকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা সুরু।

চলিয়াছে···চলিয়াছে···চলিয়াছে···

পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই আর উৎরাই। উৎরাই আর চড়াই।

মাঝে মাঝে বড় বড় হ্রদ। নির্ঝর-ধারায় আরাম-করা সুর-সঙ্গীত! পদে-পদে দৃশ্যপট উল্‌টাইয়া নব-নব বৈচিত্র্য!

হরেনের রোমাঞ্চ হইতেছিল! কেবলি মনে হইতেছিল, পৃথিবী এমন সুন্দর! আর এই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া কোথায় কালি-ঝুলিমাখা হট্টগোল-মুখরিত বদ্ধ বিশ্রী সহর কলিকাতায় কিসের মায়ায় সে পড়িয়া ছিল!

ফল-ফুলের অজস্র কানন। কে এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া রচনা করিয়াছে?

দেখিয়া হরেনের বিস্ময়ের সীমা নাই! এত শোভা! এমন ঐশ্বর্য্য! জন-মানবের চিহ্ন কিন্তু কোথাও নাই!

হরেনের মনে হইতেছিল, ছেলেবেলায় রূপকথায়-শোনা এ যেন সেই নিঝুম-পুরী! রাজা, রাণী, রাজকন্যা, প্রজার দল··· যেন কোন্ দৈত্যের মায়ায় দিনের বেলায় সব মূর্চ্ছিত অদৃশ্য হইয়া আছে! রাত্রে এই বিরাট পাহাড়-প্রান্তর ভরিয়া যেন বিপুল কলরব জাগিয়া উঠিবে···রাজ-বাড়ীতে কাড়া-নাকাড়া বাজিবে···প্রমোদ-নাট্যশালায় নৃত্যগীতাভিনয় সুরু হইবে··· সিপাহী-শান্ত্রী-প্রহরীদের অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা উঠিবে!

সত্যই তাই ?···

হরেন চলিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় চলিতেছে না ! কে যেন তার আগে-আগে চলিয়াছে···আর সে তাকে মায়া-মন্ত্রে এমন বিমুগ্ধ করিয়াছে যে হরেনের না গেলে চলে না···হরেনের ফিরিবার উপায় নাই···হরেনও চলিয়াছে।

ঘোড়া থামাইয়া আবার একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর।···শর্ট-সার্ট-পরা সে-সব লোক···তারা যেন প্রাচীরের গায়ে রেখার মতো মিশিয়া আছে···চলন্ত রেখা !

তার গায়ে রোমাঞ্চ ! ও প্রাচীর ভেদ করিয়া কি করিয়া সে আসিল ? পৃথিবীর যে-দিক হইতে আসিয়াছে, সে চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এই পাহাড় আর বনানী যেন সেদিককার কপাট বন্ধ করিয়া এদিককার সঙ্গে তার যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে !

আরো খানিকটা আসিবার পর ছোট একটা বস্তী। ভুটানী-বস্তী। এদিককার ভুটানী-বস্তী আর-এক রকম।

বস্তী হইতে একজন ভুটানী উঠিয়া তার কাছে আসিল···

হরেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ! তার ঘোড়া চলিয়াছে। ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সে চলিয়াছে।

লোকটা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আধ মাইল আসিবার পর সে বলিল—হোয়্যার গো ? (কোথায় চলেছো) ?

এখানে ইংরেজী কথা শুনিয়া হরেনের বিস্ময় হইল ! হরেন ঘোড়া থামাইল। জিজ্ঞাসা করিল—হু ইউ ? (তুমি কে ?)

লোকটার মুখে হাসির রেখা! সে বলিল—আই ভুটান্। ইউ?

হরেন বলিল—আই ক্যালকাটা।

লোকটার হাসির রেখা আর একটু দীর্ঘ হইল। সে বলিল—আই ওয়াজ ক্যালকাটা লং-লং বিফোর (আমিও কলিকাতায় ছিলাম অনেক-দিন আগে)।

ঘোড়া চলিল। লোকটা সেই সঙ্গে চলিল।

আরো আধ ঘণ্টা! লোকটা ইংরেজীতে আবার বলিল—কোথায় যেতে চাও?

হরেন বলিল—ভুটান পার হয়ে হিমালয়। তার পর তিব্বত। চীন, মোঙ্গোলিয়া, রাশিয়া!

শুনিয়া সে বলিল—গুড্ ওয়ার্ড (বেশ কথা)! আই গো উইথ্ ইউ (আমি আজ তোমার সঙ্গে যাবো)!

দুজনে চলিয়াছে।

পাহাড়ের বুক এখানে সমতল। পাহাড় হইতে নামিয়া পথ যেন পৃথিবীর বুকে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে!

প্রায় এক-ঘণ্টা চলিবার পর আবার একটা বস্তী। দশ-বারো জন ভুটানী বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল।

ঘোড়া দেখিয়া হৈ-হৈ শব্দে সে-দল হইতে ছিটকাইয়া পাঁচ-সাত জন লোক ঘোড়ার সামনে আসিয়া হাজির!

ভুটানী অনুচরটিকে লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ী-রুক্ষ-ভাষায় তারা কি প্রশ্ন করিল। ভুটানী অনুচর তার জবাব দিল সেই ভাষায়। হরেন এ-ভাষা বোঝে না। তাদের কথার অর্থ বুঝিল না।

সে ঘোড়া থামাইল না। এ-দলের মধ্য হইতে দুজন লোক

হরেনের সেই ভুটানী-অনুচরের সহিত কথা কহিতে কহিতে সহগামী হইল।

খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, নবাগতদের মধ্য হইতে একজন একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া শপাং করিয়া ঘোড়ার পিঠে আঘাত করিল। সে-আঘাতে ঘোড়া সামনের দুই পা তুলিয়া লাফ দিল। পাহাড়-পথ,—হরেন পাকা ঘোড়-সওয়ার নয়···যদি বিপদ ঘটে! হরেন রাগ করিল!

দু চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া সে চাহিল তার সেই ভুটানীর পানে, কহিল—উহাদের মানা করো। এমন যেন না করে!

যে-লোকটা ঘোড়ার পিঠে ডাল দিয়া মারিয়াছিল, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পানে হরেন চাহিল। চাহিয়া দেখে, লোকটার চোখের দৃষ্টি যেন মানুষের দৃষ্টির মতো নয়! সে-দৃষ্টিতে যেন বাঘের চোখের ক্ষুধিত হিংসা ফুটিয়া আছে!

হরেনের ভর্ৎসনা ভুটানী তাকে বুঝিয়া দিল। সে কি বুঝাইল, হরেন বুঝিল না! আবার সে ঘোড়ার পিঠে ডাল মারিল। ঘোড়া আবার লাফ দিল।

কোনোমতে ঘোড়াকে শান্ত করিয়া হরেন সেই লোকটার পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ-মিনিট। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হরেনের রক্ত হিম হইয়া গেল! লোকটার দৃষ্টিতে ধারালো ছুরি! মানুষের চোখে এ কি দৃষ্টি··· হরেন এমন দৃষ্টি পূর্বে দেখে নাই! এমন দৃষ্টির কল্পনা তার মনে জাগে নাই!

যে-লোকটা ঘোড়াকে মারিয়াছিল, সে আসিয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিল। বেশ কষিয়া ধরিল।

হরেনের মনে হইল, তার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে! মাথার মধ্যে ঝিমি-ঝিমি···দু'চোখের সামনে পাহাড়-বন একাকার

হইয়া মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! হরেনের মনে হইল তার প্রাণের লীলা যেন শেষ হইয়াছে! জীবনের উপর মৃত্যুর কালো পর্দ্দা যেন ঐ নামিয়া আসিতেছে!

পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য তখন একেবারে লালে লাল! আকাশের সূর্য্য সন্ধ্যায় রক্ত-সাগরে স্নান করিয়া যেন রক্ত মাখিয়াছে! পাহাড়ের বুকে বড় বড় পাইন গাছের শ্রেণী। পাইনের সবুজ পত্র-পল্লবের উপর সে রক্ত যেন ঢেউ তুলিয়া দিল!

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল···হরেন ঘোড়ার পিঠে বসিয়া রহিল নিস্পন্দ জড় পুতুলের মতো!

সাত

এমনি নিস্পন্দ নিশ্চেতন পুতুলের মতো ঘোড়ার পিঠে বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া কত পথ অতিক্রম করিয়া আসিল, হরেনের খেয়াল নাই! সে শুধু চলিয়াছে···চলিয়াছে···চলিয়াছে! দু'পাশে পর্দা তুলিয়া গাছপালা, পাহাড়···এরা যেন স্তব্ধ নেত্রে কৌতুক-ভরে এই মহাপ্রয়াণের পথে তার মহাযাত্রা দেখিতেছে!

কখন এক সময় সহসা তার চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিলে হরেন বুঝিল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, আর চাঁদের জ্যোৎস্নায় পাহাড়-বন ভরিয়া গেছে।

গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। স্বপ্নপুরীতে আসিল না কি? শব্দ নাই! পাতায়-পাতায় এতটুকু মর্ম্মর-ধ্বনি নয়! একবার মনে হইল, সে সত্য সেই হরেন? না, মায়া-কাঠি বুলাইয়া কে তাকে পাথরের মূর্ত্তি করিয়া দিয়াছে?

কিন্তু না, পাথরের মূর্ত্তি নয়! পাথরের মূর্ত্তির আঁকা চোখ··· সে-চোখে সে কিছু দেখিতে পারে না···দেখিতে পায় না! হরেন চোখে দেখিতেছে···মাথার উপরে আকাশ···আকাশে চাঁদ···তার চিরদিনের চেনা চাঁদ···সামনে আশে-পাশে পাহাড়, তরু-পল্লব···নির্ঝর···আর পাশে এই তিনজন ভুটানী··· সে ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আছে···সে-ঘোড়া চলিয়াছে··· ভুটানীরা তার সঙ্গে চলিয়াছে! সকলে চলিয়াছে।

মাঝে মাঝে তারা কথা কহিতেছিল। সে-কথা না বুঝিলেও

হরেন এটুকু বুঝিতেছিল যে পুরানো সঙ্গীর ভাব কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত! নবাগত দু'জনের উল্লাস একেবারে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে!

বহুদূর আসিয়া একটা অনিবিড় বন-কুঞ্জ। পুরানো সঙ্গী বলিল—আজ রাত্রে আর যাওয়া হবে না…এখানে রেস্ট (বিশ্রাম)!

হরেনের দেহ ক্লান্তিভরে অবসন্ন। কোনো মতে সে ঘোড়া হইতে নামিল।

পড়িয়া যাইতেছিল, ভুটানীরা তাকে ধরিয়া নামাইল। ঘোড়া থামাইয়া হরেনকে তারা পাহাড়ের কোলে বসাইয়া দিল।

ক্ষুধায়, পিপাসায় হরেনের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইবে, এমন অবস্থা!

কাছে সুর-কল্লোল তুলিয়া পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া ছোট একটি ঝর্ণা। নবাগতদের মধ্যে একজন ভুটানী কাছের একটা গাছ হইতে কতকগুলা ফল পাড়িয়া আনিল। হরেনকে দিল, দিয়া নিজেরা খাইতে বসিল। হরেন কোনোমতে গিয়া ঝর্ণার ধারে বসিয়া পড়িল; বসিয়া হাতের দুই অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

দু'চোখে ঘুমের ঘোর। মনে হইতেছিল, আর বাঁচিয়া কাজ নাই! এতদিন যে বাঁচিয়াছিল, এই ঢের! বাঁচিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে!

দেহ-মন যা হইয়াছে…কোনোমতে যদি একটু শুইতে পায়, আঃ, প্রাণটাকে মৃত্যুর কোলে সঁপিয়া হরেন তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া জন্মশোধ ঘুমায়!

পরিচিত ভুটানীকে সে প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম কি ফ্রেণ্ড ?

হাসিয়া সে বলিল—ত্র্যম্বক।

হরেন বলিল—বড্ড ঘুম পেয়েছে···

ত্র্যম্বক বলিল—ঘুমোও···

হরেন বলিল—এদের নাম ?

ত্র্যম্বক নাম বলিল।

যে-লোকটি ঘোড়াকে মারিয়াছিল, তার নাম হর্দ্দে; তার সঙ্গীর নাম জরদ।

হরেন বলিল—দে ফ্রেণ্ডস্ (ওরা বন্ধু) ?

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস্।

পাহাড়ের গায়ে ছোট গুহা।

বাহিরে খুব শীত···হাড়-পাঁজরা ঝন্‌ঝন্ করিতেছে।

গুহার মধ্যে কম্বল-মুড়ি দিয়া হরেন শুইয়া পড়িল।

ঘোড়াকে বাঁধা হয় নাই। বাঁধিবে, সে-শক্তি নাই। একবার মনে হইল, এরা যদি ঘোড়া লইয়া পলায় ? পরক্ষণে মনে হইল, পলায়, উপায় কি ? ইহাদের হাতে পড়িয়াছি, পরিত্রাণ পাইব, সে-আশা আর আছে না কি ?

হরেন চোখ বুজিল। এত ঘুম পাইতেছে···চোখে ঘুম নাই ···সর্ব্বশরীর সে-ঘুমে আচ্ছন্ন !···চোখে সে-ঘুম কিছুতে আসিয়া বসিতে চায় না !

হরেন মনে-মনে বলিতেছিল, আয় ঘুম ! ঘোড়া যদি পলায়, ঘোড়াকে যদি উহারা মারিয়া ফেলে ? দুঃখ নাই ! এখন চাই ঘুম আর ঘুম ! এ দুশ্চিন্তার দায় হইতে তাহা হইলে মুক্তি মিলিবে !

চোখে একবার করিয়া ঘুম আসে, অমনি সারা দেহে-মনে কে যেন চমক লাগায়…সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে হরেন প্রাণপণ-বলে আবার চোখ চাহিবার চেষ্টা করে…পারে না! কে যেন আঠা দিয়া দু'চোখের পাতা আঁটিয়া দিয়াছে! কি দুর্গ্রহ! কি দুর্ভোগ!

এ-দুর্ভোগ হরেন আর সহিতে পারে না!

এমনি আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে এক-একবার মনে হয়, এ কি মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ? আসিবার পূর্ব্বে মরণ কি এমনি করিয়া সম্মোহন-বাণে দেহে-মনে ঘুম আনিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়? মানুষের চেতনার উপর কি এমনি করিয়া মৃত্যু নিশ্চেতনতার পাথর টানিয়া দেয়?

ওদের তিনজনের কণ্ঠস্বর কাণে আসিয়া বিঁধিতেছে! ওরা কি কথা কয়? মন্ত্রণা? ষড়যন্ত্র?

কিসের মন্ত্রণা? টাকা চায়? টাকায় হরেনের কি প্রয়োজন? তার কাছে টাকা-পয়সা যা আছে, খুশী-মনে সে উহাদের হাতে এখনি দিয়া দিতে পারে! তবে?

সারা দেহ সহসা কেমন কাঁপিয়া উঠিল! মন বলিল, এ পথে কেন আসিয়াছিলে? ভাবিয়াছিলে, তুমিও মহাবীর সেকন্দর শাহ! হায়রে, ক্ষুদ্র একটা পতঙ্গের নড়িবার যে-শক্তি আছে, সে শক্তি তোমার নাই! জানো, মহাবীর সেকেন্দর শাহের সঙ্গে ছিল দশ-বিশ লক্ষ ফৌজ! তিনি তোমার মতো …দুঃসাহস বা পাগলামির উপর ভর করিয়া একা দিগ্বিজয়ে বাহির হন নাই!

ভাবিল, এই তো মানুষের শক্তি! এ শক্তির গর্ব্ব মানুষ কি ভরসায় করে?

প্রকাশের কথা মনে পড়িল···সেই সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ঠাকুর-দেবতা! মনে পড়িল, প্রকাশ বলিয়াছিল, প্রকাশ এ-সব মানে না!

হরেন মানে। কিন্তু মানিয়া তার কি ভালো হইতেছে?

মন বলিল, নিশ্চয় হইবে! ডাকো তুমি তোমার ঠাকুর-দেবতাকে। তাঁরা তোমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না?

ঠাকুর-দেবতার কথা মনে পড়িবা মাত্র সেই সঙ্গে মনে হইল, কোন্ ঠাকুরকে ডাকিবে?

প্রথমে মনে পড়িল, ছিন্নমস্তা দেবী!

মনে মনে ডাকিল—এ-পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হে মাতঃ ছিন্নমস্তা···দাও, আমার চেতনা ফিরাইয়া দাও! আমাকে আমার শক্তি ফিরাইয়া দাও! তোমার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছি মা! আমাকে এমন জড় পুতুল করিয়া ফেলিয়া রাখিয়ো না!

হরেন ডাকিতে লাগিল,—ছিন্নমস্তা দেবী···মা ছিন্নমস্তা···মা দশ-মহাবিদ্যারূপিণী···

ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে হরেনের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বুকের মধ্য হইতে এক-ঝলক রক্ত যেন বন্যার স্রোতের মতো মাথায় গিয়া উঠিল! কে যেন তার দু'চোখ সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে!

সকালে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসের স্পর্শ! মায়ের স্নেহ-স্পর্শের মতো···

চোখ বুজিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে হরেন ডাকিল,—মা···মা··· আমার মা···

তারপর বুঝিল, মা নন্‌···বাতাস! বাতাসের স্পর্শ এ বাতাসের সে-স্পর্শে হরেন চোখ খুলিল।

যখন চোখ খুলিল, আলো! গুহার মধ্যকার সে-অন্ধকার কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

কম্বল জড়াইয়া হামা দিয়া গুহার বাহিরে আসিল।

আসিয়া দেখে, ভুটানী তিনজন বসিয়া আছে।

হরেন ডাকিল—বন্ধু···

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস্‌···

হরেন বলিল—এবার আবার গোইং (যাওয়া)?

ত্র্যম্বক চাহিল হর্দ্দে আর জরদের পানে। তিনজনের চোখে-চোখে ইঙ্গিত বহিয়া গেল।

তারপর ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস্‌···

হরেন বলিল—আমার হর্শ (ঘোড়া)?

লাগাম ধরিয়া জরদ ঘোড়া আনিয়া দিল।

হরেন বলিল—নো ফুড? আই হাঙ্গরি (খাবার নাই? আমি ক্ষুধার্ত্ত)!

ত্র্যম্বক কতকগুলা বাদাম দিল হরেনের হাতে। হরেন হাসিল, বলিল—সো থার্ষ্টি (খুব পিপাসা)।

ত্র্যম্বক বলিল—ভ্যাট্‌ ওয়াটার (ঐ জল)।

সে দেখাইল ঝর্ণার দিকে। ঝর্ণার কথা হরেন ভুলিয়া গিয়াছিল।

ত্র্যম্বকের কথায় ঝর্ণার ধারে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঝর্ণার জল পান করিল; তারপর বাদাম ভাঙ্গিয়া মুখে দিল। বাদামের খোলা বেশ পাৎলা। আঙুলের চাপ দিবামাত্র খোলা ভাঙ্গিয়া গেল।

তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে সেই আসন। ঘোড়া চড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভুটানী তিনজন।

হরেনের অস্বস্তি ধরিতেছিল! একা বেশ আসিতেছিল··· এমনি একা ঘোড়ায় চড়িয়া পৃথিবীর প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত সে যাইতে পারে! কিন্তু সঙ্গে এই এরা? অদৃষ্টের মতো কেন তাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল? সঙ্গ লইয়াছে কেন? কি চায়? কিসের লোভে?

টাকা-কড়ি?

হরেন ডাকিল,—ফ্রেণ্ড···

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস্···

হরেন বলিল—তোমার বন্ধুরা টাকা চায়?

ত্র্যম্বক চাহিল হর্দ্দে এবং জরদের পানে। চাহিয়া কি প্রশ্ন করিল। তারা সে প্রশ্নের জবাব দিল। ত্র্যম্বক বলিল—না। টাকা চায় না।

হরেনের রাগ হইল, বলিল—তবে কি চায়?

ত্র্যম্বক বলিল—কিছু না···

হরেন বলিল—দুজনে বেশ যাচ্ছিলুম। ওদের যেতে বলো না কেন?

তাদের উদ্দেশ করিয়া ত্র্যম্বক কি কথা বলিল। তারা সে কথার জবাব দিল।

তারপর ত্র্যম্বক ফিরিয়া চাহিল হরেনের পানে, বলিল—ওরা বলছে, চলার পথে সকলেই চলে। পথে সকলের অধিকার আছে। তুমি চলেছো, ওরাও চলেছে। জীবনের পথ নিঃসঙ্গ হয় না।

হরেনের রাগ হইল। পাজী-বদ্‌মায়েস! নিশ্চয় কোনো শয়তানী মতলব আছে···সে মতলব চাপিয়া আধ্যাত্মিক কথা বলিতেছে!

হরেন ভাবিল, যদি ফিরিয়া যাই? না গেলেও ইহাদের কাছে যদি সেই কথা বলি?

হরেন বলিল—আমি এবার ফিরিব।

ত্র্যম্বক বলিল—না···

না! হরেন আবার রাগ করিল, বলিল—যদি ফিরি?

ত্র্যম্বক বলিল—এখানে এলে ফেরা যায় না বন্ধু! শুধু সামনে যেতে হয়।

আশ্চর্য্য কথা! শুধু সামনে যাইতে হয়! হুকুম? বটে! কে এমন হুকুম দিয়াছে? হরেন এ-হুকুম মানিবে না!

হরেন বলিল—কিসের আশায় মানুষ সামনে যায়?

ত্র্যম্বক বলিল—তা কেউ জানে না। তবু মানুষ শুধু সামনে চলে।

হরেন ভাবিল, বাঃ, এ-লোকটাও আধ্যাত্মিক কথা কয়! মনে হইল, পৃথিবী ছাড়িয়া সে কোনো ধর্ম্মগ্রন্থের পাতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল না কি? না, স্বপ্ন দেখিতেছে?

কিন্তু ইহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই! সামনেই চলা যাক! আমি আছি ঘোড়ার পিঠে। সমতল প্রান্তর পাইলে ঘোড়াকে গুঁতা মারিয়া এমন জোরে ছুট করাইয়া দিব··· একেবারে তীরের গতি···তখন দেখিব, কোথায় থাকে উহাদের এমন সাঁটিয়া-থাকার শয়তানী···আর ঐ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথা!

আট

প্রায় দু ঘণ্টা কাটিল। সমতল প্রান্তরের দেখা মিলিল না। শুধু বরফ আর বরফ। বরফে পাহাড়ের গা ভরিয়া আছে। সবুজ মখমলের আবরণের উপর যেন রূপার চাদর বিছানো!

বাতাস বহিতেছে···সে বাতাসে শীতের কাঁপন! হরেন গায়ে কম্বল জড়াইল। হাত খোলা। হাত দুটো যেন বরফে জমিয়া যাইবে! হিমের নিস্পন্দতায় দু হাত অসাড় হইয়া আসিতেছে!

পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া মস্ত একটা ঝর্ণা। তীব্র বেগে হাতীর শুঁড়ের ধারায় জল পড়িতেছে···সেই পাতালের মুখে। জল পড়িয়া বিস্তীর্ণ হ্রদ। সে হ্রদের একদিককার খিল কে খুলিয়া দিয়াছে! সেই খিল-খোলা পথে জল-ধারা গড়াইয়া খেলায়-মত্ত বালকের মতো লাফাইতে লাফাইতে উল্লাসে মাতিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন কোন্ রসাতলের বুকে!

এই নদীর তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে আবার এক বস্তী। সেখানে অনেক লোক। একটা মন্দির। মন্দিরের চূড়া যেন তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে আকাশের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে!

মন্দির দেখিয়া হর্দে আর জরদ যেন মাতিয়া উঠিল! হরেন তাদের সে-আনন্দ লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল। এ আনন্দের অর্থ?

তারপর পাহাড়ের পাষাণ-সোপান অতিক্রম করিয়া সবুজ শ্যামল বিস্তীর্ণ উপত্যকা। তার বুকের উপর দিয়া রূপার পাতের মতো স্রোতস্বতী বহিয়া চলিয়াছে। নদীর দুই তীরে পাথরের প্রাচীরে ঘেরা ঘর-বাড়ী। নদীর বুকের উপর গাছফেলা সরু পুল।

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া মুগ্ধ নয়নে হরেন দেখিল। চমৎকার দৃশ্য! মনে হইল, পাহাড় পার হইয়া যেন মায়া-পুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

এমন দৃশ্য! তবু কি অজানা ভয়ে তার বুক ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল।

এ-পথ গিয়াছে ঐ মায়া-পুরীর দিকে। পথের দুদিকে ফুলের অজস্র কুঞ্জ···সে-সব ফুলের তুলনা হয় না!

পথ গিয়া পুরীর সীমানায় মিশিয়াছে! দেবদারুর সার··· এগুলা ইউকালিপটাস গাছ···ওগুলা চেনার···

একজন রাখাল···মাথার উপর ঝুড়ি চাপাইয়া কতকগুলা ছাগল চরাইতেছে। ছায়ায় বসিয়া কতকগুলা ভুটানী নর-নারী···

তাদের দেখিয়া হর্দ্দে আর জরদ সেই ছায়া-কুঞ্জের দিকে ছুটিল। এখানে এখন হরেন আর ত্র্যম্বক।

হরেন বলিল—চলি?

ত্র্যম্বক বলিল—না।

হরেন বলিল—আমি যাবো তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া···

ত্র্যম্বক বলিল—না। এরা যেতে দেবে না।

হরেন বলিল—যেতে দেবে না কেন? তোমরাই তো বলেছো, মানুষ শুধু এগিয়ে চলে···

ত্র্যম্বক কোনো জবাব দিল না···হরেনের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছায়া-কুঞ্জে একটা চাঞ্চল্য! তারপর ঐ হর্দে আর জরদ ফিরিয়া আসিতেছে···তাদের সঙ্গে আসিতেছে এক বৃদ্ধ ভুটানী।

হরেন ঘোড়ার লাগাম ধরিল···ঘোড়া শুধু মাথা নাড়িল!

হরেনের বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল! বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল·· সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সব যেন কালো ধোঁয়ার নীচে ঢাকিয়া গেল! ঘোড়ার পেটে সজোরে পদাঘাত করিল। দু'পা তুলিয়া ঘোড়া একবার লাফাইয়া উঠিল···এক-পা অগ্রসর হইল না! কে যেন মন্ত্র পড়িয়া তার গতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

হর্দে আর জরদকে সঙ্গে লইয়া বুড়া ভুটানী আসিল ঘোড়ার কাছে।

ত্র্যম্বক বলিল—প্রধান পুরোহিত। তন্ত্রে-মন্ত্রে দেশের মঙ্গল যা-কিছু, তা ইনিই করেন।

বুড়া আসিয়া ত্র্যম্বককে কি প্রশ্ন করিল।

ত্র্যম্বক সে-কথা হরেনকে শুনাইল, বলিল—পুরোহিত জিজ্ঞাসা করছেন, এখানে তুমি কিসের সন্ধানে এসেছো?

চকিতের দ্বিধা! হরেন বলিল—আমি? না, কোনো-কিছুর সন্ধানে আসিনি। শুধু দেশ দেখতে বেরিয়েছি। এক পৃথিবীতে সকলে বাস করি · সেই পৃথিবী দেখবো, সকলকে দেখবো!

ত্র্যম্বক একথা বুঝাইয়া দিল। উত্তরে ত্র্যম্বককে বুড়া কি বলিল।

ত্র্যম্বক হরেনকে বলিল,—পুরোহিত বলছেন, পৃথিবী খুব বড়। তোমার ভগবান তোমাকে যে-জায়গায় থাকতে দেছেন, সে জায়গায় খুশী হয়ে না থেকে পরের জায়গা দেখবার লোভ

তোমার কেন হলো ? পুরোহিত বলছেন, তোমার পৃথিবীর দেবতাকে আমাদের পৃথিবীতে চালাতে এসেছো, বুঝি ? একদিন তোমাদের বুদ্ধদেব এই কাজ করে এ-দেশের সর্ব্বনাশ করে গেছেন।

কথা শুনিয়া হরেন অবাক ! হরেন বলিল—না, না, তা নয়, বন্ধু। বুদ্ধদেব ছিলেন দেবতা। আমি সামান্য মানুষ। আমার দেশ···তোমার দেশের মতো। সে-দেশ ছেড়ে আমি বেরিয়েছি···অন্য দেশের দেবতাদের আপন করে নিতে। মানুষে-মানুষে ভেদ নেই, এ-কথা সত্য কিনা, তাই বুঝতে এসেছি।

ত্র্যম্বক কথাটা বুড়া ভুটানীকে বুঝাইয়া দিল।

তারপর নিবিড় স্তব্ধতা···কাহারো মুখে কথা নাই।

অনেকক্ষণ পরে সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুড়া ভুটানী কথা কহিল। বলিল—আমাদের দেবতা যদি না ডাকেন, তাহলে এ-দেশে কেউ আসতে পারে না। আসবার সাধ্য কারো নেই ! পাছে কেউ আসে, সেজন্য এদেশের চারিদিকে বড় বড় পাহাড়ের পাঁচিল তুলে আমাদের দেবতা তোমাদের দেশের আড়ালে এমন করে আমাদের লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের এদেশ সত্যিকারের দেবতার দেশ।

হরেন বলিল—নিশ্চয়। তোমাদের দেবতাই আমাকে ডেকেছেন। তাই আমি এসেছি · দেবতার ইচ্ছায় এসেছি। দেবতার ইচ্ছা না হলে মানুষ কী করতে পারে, বলো ?

এ-কথা বুড়াকে বুঝাইয়া দিলে বুড়ার মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল।

বুড়া বলিল—ওকে নিয়ে এসো।

হর্দ্দে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল ; এবং ঘোড়াকে টানিয়া

ঘোড়ার পিঠে-চড়া হরেনকে লইয়া সকলে আসিল ছায়া-কুঞ্জের পিছনে পাথরের ঘরে।

বুড়া বলিল—খুব ক্লান্ত হয়েছো ?

ত্র্যম্বক দোভাষীর কাজ করিল।

হরেন বলিল—হ্যাঁ।

বুড়া বলিল—ঘোড়া থেকে নামো। তোমার জন্য ডুলি আসছে।

হরেন ঘোড়া হইতে নামিল।

চারিদিক হইতে চকিতে ভুটানীরা আসিয়া ভিড় জমাইল। সকলের চোখে বিস্ময় যেন জীবন্ত-জাগ্রত! বিস্ময়ের সে-ভঙ্গী দেখিয়া হরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কাহারো মুখে কথা নাই! কে যেন তালা-চাবি দিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে!

ডুলি আসিল। হরেন ডুলিতে বসিল।

অবসাদে ভরিয়া দেহ এমন হইয়াছে যে বসিবামাত্র সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইল। হরেনের চেতনা লোপ পাইল!

চেতনা ফিরিলে হরেন দেখে, পাথরের মেঝেয় সে শুইয়া আছে…চারিদিকে পাথরের প্রাচীর…মাথার উপরে শুধু একটু নীল আকাশ।

কাছে বসিয়া ত্র্যম্বক আর সেই বুড়া পুরোহিত।

তাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া ত্র্যম্বককে বুড়া কি বলিল।

হরেনের পানে ত্র্যম্বক চাহিল, কহিল—ও-সব পোষাক ছেড়ে এখানকার পোষাক পরতে হবে। এ দেশের নিয়ম।

কথাটা বলিয়া ত্র্যম্বক হরেনের হাতে ভুটানী পোষাক দিল।

হরেন বিনা-বাক্যে সে-পোষাক লইল। প্রতিবাদ তুলিবার মতো শক্তি তার ছিল না।···

দু' দিন···তিন দিন···সাত দিন কাটিয়া গেল। সেই এক ঘরে হরেন সাত দিন, সাত রাত বন্দী।

আট দিনের দিন ত্র্যম্বক আসিল।

হরেন বলিল—আমায় এমনি বন্ধ করে রাখবে ?

ত্র্যম্বক বলিল—না। পুরোহিত বলেছে, ঘরের বাইরে বাগান আছে। সে বাগানে তুমি বেড়াতে পারো।

তামার পাত্রে ত্র্যম্বক আনিয়াছিল পানীয়। বলিল—পূজার চরণামৃত···খাও।

হরেন বিস্ময় বোধ করিল। আমাদের দেশের মতো পূজার সেই বিধি···পূজাশেষে চরণামৃত পানের ব্যবস্থা !

কোনো দেবতার উপর হরেনের বিরাগ নাই ! সকল ধর্ম্মের সব দেবতাকে সে মানে। ত্র্যম্বকের কথায় হরেন চরণামৃত পান করিল।

ত্র্যম্বক বলিল—ভালো লাগলো ?

হরেন বলিল—আমাদের দেশের চরণামৃতের মতো নয়। অন্য-রকম স্বাদ···ঝাল, কষা, মিষ্টি, নোস্তা···

ত্র্যম্বক বলিল—হ্যাঁ। এ চরণামৃত পান করলে দেহে-মনে আরাম মেলে।

ত্র্যম্বক চলিয়া গেল।

হরেন নিঝুম বসিয়া রহিল···অনেক ক্ষণ···

হঠাৎ মনে পড়িল, ঘরের বাহিরে বাগান। সে বাগানে যাইবার অধিকার তার আছে।

নয়

আরো পাঁচ-ছ দিন পরের কথা।

হরেন এখন ঘরের বাহিরে বাগান পার হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যায়। অনুমতি মিলিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো আসিয়া মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়।

শূন্য মন্দির। দেখিয়া তার বিস্ময়ের সীমা নাই! এরা ধর্ম্ম লইয়া এত তত্ত্ব-কথা বলে, অথচ মন্দির এমন শূন্য পড়িয় আছে কেন?

সেদিন বুড়া পুরোহিত আসিল তার সঙ্গে কথা কহিতে; সঙ্গে রহিল শুধু ত্র্যম্বক···দুজনের কথা তর্জ্জমা করিয়া দিবে।

নর-নারীর পোযাকের রঙে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া হরেনের মনে যেমন কৌতুক, তেমনি কৌতূহল!

সে প্রশ্ন করিল—তোমাদের পুরুষদের দেখি, সকলেই লাল, নীল—নানা রঙের কুর্ত্তা গায়ে দাও। মেয়েদের গায়ে দেখি শুধু কালো রঙের কুর্ত্তা। এর মানে?

পুরোহিত বলিল—মানে আছে। পুরুষ-মানুষ হলো আকাশের সূর্য্য···আর মেয়েরা হলো চাঁদ। পুরুষ আলো দেয়, তেজ দেয়। চাঁদের আলো? চাঁদের ও-আলো সূর্য্যের কাছ থেকে ধার করা। মেয়ে-মানুষের যা কিছু শক্তি, তা শুধু পুরুষের দৌলতে!

হরেন এ-কথার অর্থ বুঝিল না···চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পুরোহিত বলিল—পাহাড়ের ওদিকে তোমরা থাকো—পৃথিবীর কিছুই জানো না! তোমরা বলো বিজ্ঞান···বিজ্ঞানে তোমাদের ভয়ঙ্কর দখল। বিজ্ঞানের জোরে আলো-বাতাস, আকাশের বিদ্যুৎকে তোমরা বন্দী করেছো! বিদ্যুৎ তোমাদের পথে-ঘাটে-ঘরে আলো ছায়···ঘরে তোমাদের পাখা চালিয়ে বাতাস করে। আগুন তোমাদের তাঁবেদারী করে। সাগরকে তোমরা এমন করেছো যে তার বুক বয়ে যাতায়াত করো, সাগর তোমাদের গিলতে পারে না। বাতাস তোমাদের কথা বয়ে দূর-দূরান্তরে নিয়ে যায়। এদেশে বসে তোমরা বহু-দূর-দেশের গান শোনো। এখানকার খপর এক-মিনিটে তোমরা পাঠাও সাত-সমুদ্দরের পারে।···আমাদের দেশ থেকে যে-সব লোক তোমাদের দেশে যায়, তারা ফিরে এসে আমাদের কাছে এই সব কথা বলে। শুনে আমরা হাসি।···আমরা বলি, তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ···আলো, বাতাস, বিদ্যুৎ! এ-সব হলো খেলনা। খেলনা নিয়ে তোমরা এমন ভুলে আছো যে দেবতার কথা আর তোমাদের মনে জাগে না।···

হরেন বলিল—আমরা দেবতা মানি। দেবতার পূজো করি। আমাদের দেশে দোল হয়, দুর্গোৎসব হয়, কালী পূজো, লক্ষ্মী পূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, গঙ্গা পূজো—কোন্ দেবতার পূজো আমরা না করি, বলো? মায় মাকাল-ষষ্ঠী পর্য্যন্ত!

পুরোহিত বলিল—ও-সব ছেলেখেলা। দেবতা আছেন শুধু একজন···ঈশ্বর। তোমরা এত দেবতা লেলিয়ে দেছ বলে আমাদের দেবতা মন-মরা হয়ে আছেন! তিনি কি আদেশ দেছেন, জানো?

হরেন বলিল—কি ?

পুরোহিত বলিল—তিনি আদেশ দেছেন, পাহাড়ের ওদিকটা হলো সভ্যদের দেশ···অহঙ্কারের দেশ! দরকার হলে তোমরা দেবতার নাম নাও—না হলে সব সময় নিজেদের অহঙ্কারকেই সর্ব্বস্ব করে রেখেছো! যা-কিছু কাজ করবে, সে-কাজ সিদ্ধ হলে তোমরা বলো, তোমরা করেছো! আর কাজ যখন পণ্ড হয়, বলো, দেবতার চক্রান্ত! মাঠে যখন খুব ফশল হয়, তখন বড়াই করে বলো, তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে হয়েছে! আর যে-বছর ফশল হয় না, বলো, দেবতা বৃষ্টি দিলে না, তাই এ অজন্মা!···তোমাদের এই অহঙ্কার চূর্ণ করতে না পারলে আমাদের দেবতা তুষ্ট হবেন না! দেবতা তুষ্ট না হলে আমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে না। তাই আমাদের দেবতার আদেশ···

কথাটা বলিয়া পুরোহিত চুপ করিল। পুরোহিতের গম্ভীর মুখ দেখিয়া হরেনের বুকে মৃদু কাঁপন! হরেন বলিল—কি আদেশ, শুনি···

পুরোহিত বলিল—দেখবে দুশ্চিন্তায় আমাদের দেবতার কি-মূর্ত্তি হয়েছে ?

কথাটা বলিয়া হরেনকে লইয়া পুরোহিত কতকগুলা পাথরের সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া কহিল—ঐ ছাখো···

হরেন দেখিল, পাথরের জীর্ণ বেদী। সেই বেদীর উপর দেবী-মূর্ত্তি···মূর্ত্তির কাঁধে মাথা নাই! দেবীর দেহে নরমুণ্ডমালা ···মানুষের খুলি, অস্থি কঙ্কালের গহনা!

দেখিয়া হরেন শিহরিয়া উঠিল। বলিল—দেবীর মাথা নেই কেন ?

পুরোহিত বলিল—তোমাদের অনাচার আর অহঙ্কার দেখে

দেবী নিজের মাথা নিজে কেটে ফেলেছেন! দেখছো না, দেবীর সর্ব্বাঙ্গ বয়ে রুধির-ধারা বইছে···

হরেন বলিল—ছিন্নমস্তা দেবী···দশ-মহাবিদ্যার মূর্ত্তি···

পুরোহিত বলিল—ইনি তোমাদের দেশের ছিন্নমস্তা দেবী নন্···এ দেবী অন্য গোত্রের। দেবীর মাথা নেই···আমরা দেবীর এ-মাথা গড়বো···সাধনার জোরে। দেবী আমাদের আদেশ দেছেন···

পুরোহিতের দু'চোখ জবাফুলের মতো রাঙা!

স্খলিত কণ্ঠে হরেন বলিল—কি আদেশ?

পুরোহিত বলিল—দেবীর আদেশ, প্রতি-বৎসর পাহাড়ের ওপার থেকে একজন করে মানুষ আসা চাই···সেই মানুষকে বলি দিতে হবে। পাঁচশো মানুষ বলি হলে তবে আমাদের দেবী তুষ্ট হবেন। স্কন্ধে আবার তিনি মুণ্ড ধারণ করবেন! তখন ও রুধির-ধারা মিলিয়ে দেবী জ্যোৎস্নাফুল্ল প্রসন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করবেন! সেদিন তাঁর সন্তোষ হবে। তাঁর সে সন্তোষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত হবে না!

কথা শুনিয়া হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ ফুটিল!

কিন্তু মনের ভয় সবলে মনে চাপিয়া হরেন বলিল—ওপারে ব্রিটিশ-রাজত্ব···বলির জন্য ওদিক থেকে মানুষ আনলে তোমরা রক্ষা পাবে না!

পুরোহিত হাসিল···তাচ্ছল্যের হাসি!

হাসিয়া পুরোহিত বলিল—দেবতার বলি···মানুষ আনে না! দেবতার পিপাসা জাগলে তিনি ডাকেন। তাঁর ডাক মানবে না, পৃথিবীতে এমন মানুষ আজও জন্মায় নি!

হরেন বলিল—তার মানে?

পুরোহিত বলিল—চারশো নিরেনব্বই বলি হয়ে গেছে।

পাহাড়ের ওপার থেকে বলি এসেছে।...তোমাদের ঐ ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে। দেবতার ডাকে একজন করে' মানুষ ঠিক-সময়ে নিজে থেকে এসেছে আমাদের মন্দিরে। তুমি হলে পাঁচশো-নম্বরের বলি। এ-বছর তুমি এসেছো। নিজে থেকে এসেছো! আমরা তোমাকে আনতে যাইনি,...কেমন?

হরেনের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তাকে ইহাদের দেবতা ডাক দিয়াছে, তাই সে আসিয়াছে? এবং এ ডাক ইহাদের এই দেবীর সামনে বলি হইবার জন্য?

চকিতে মনকে নাড়া দিয়া সে সবল করিয়া তুলিল! মনকে বলিল, না, সে আসিয়াছে দিগ্বিজয়ে...সেকন্দর শাহ যেমন আসিয়াছিলেন নিজের ইচ্ছায় সেও তেমনি আসিয়াছে নিজের ইচ্ছায়! কোনো দেবতা তাকে ডাকে নাই!

হরেন বলিল—আমাকে তোমরা বলি দেবে?

পুরোহিত বলিল—বলি দেবার আমরা কে? কেউ নই। দেবতার বলি...দেবতার ইচ্ছায় সব হয়। আমাদের দেবীর চারশো-নিরেনব্বই-বারের ইতিহাস খুলে দেখতে পারো।

হরেনের কি মনে হইল, দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন তার শিখা দ্বিগুণ-তেজে জ্বলিয়া ওঠে, মনে তেমনি-তেজ-দীপ্তি!

হরেন বলিল—আর-বছর কে এসেছিল আমাদের মুল্লুক থেকে তোমাদের দেবীর সামনে বলি হতে, বলো দিকিনি, বাপু?

পুরোহিত বলিল—একজন মাড়োয়ারী...বৈজনাথ ধুধুরিয়া। সে এসেছিল এখানকার মধু আর মোম্ লুঠ করে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করতে! বোঝেনি, তার এখানে আসবার ডাক গেছে দেবতার দোর থেকে!

হরেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল—সে এসেছিল ব্যবসা

করতে···তোমাদের দেবতা ডেকেছিল, এ-কথা কি করে বলছো ?

পুরোহিত বলিল—দেবতা ডেকেছিল বলেই এখানে এসে ব্যবসা ফাঁদবার কথা তার মনে জেগেছিল ! নাহলে তোমাদের মুল্লুকে লক্ষ-লক্ষ মাড়োয়ারী আছে—কত মুল্লুকে তারা কত ব্যবসা করতে যায়···এ-মুল্লুকে কেউ আসেনি !

হরেন বলিল—তার আগের বছর কে এসেছিল ?

পুরোহিত বলিল—একজন ভাটিয়া। সে এসেছিল এখানকার পাহাড় লুটতে।

হরেন ভুলিল না, দমিল না, নিবৃত্ত হইল না। কহিল, তার আগের বছর ?

পুরোহিত বলিল—একটা কাবলীওলা ! এ মুল্লুকের একজন ভুটানী গিয়েছিল তোমাদের মুল্লুক কলকাতার সহরে পেটের দায়ে—টাকার লোভে। কাবলীর কাছ থেকে সেখানে সে টাকা ধার করেছিল। পঁচাশি টাকা। সেই পঁচাশি টাকার জায়গায় পাঁচ বছরে পাঁচশো-পঁচাশি টাকা দিয়েও কাবলীর হাত থেকে নিস্তার পায় নি। শেষে এখানে পালিয়ে আসে। কাবলীর এমন লোভ যে এখানে তাড়া করে সে এলো তার খোঁজে। বোঝেনি, শুধু-শুধু তার এ-সখ হয়নি।···খাতকের পিছনে কোন মহাজন এত পথ তাড়া করে ? আহাম্মক। দেবতা তাকে ডেকেছিলেন বলির জন্য···তাই সে কাবলী এ মুল্লুকে এসেছিল !

হরেনের দু' চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিবে। তবু জোর করিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল—তার আগের বছর ?

পুরোহিত বলিল—একজন সাদা রঙের সাহেব। বিলিতি

সাহেব! তার বাড়ী স্কটলাণ্ডে। নাম ম্যাকার্মিক্। আমাদের মুল্লুকের একজন লোককে লাথি-জুতো মেরেও তার রাগ যায়নি। আমাদের দেবতার মূর্ত্তিকে অপমান করেছিল। ভেবেছিল, একটা খেলনা! সে-পাপে তার হাতে বাত ধরলো। তবু মিথ্যা বীরত্বের গল্প ছাপিয়ে সে প্রচার করেছে···দেবতাকে তাচ্ছল্য করতে। দেবতা তাকে ডাক দিলেন···সে এলো আমাদের মুল্লুকে।

ম্যাকার্মিকের নাম শুনিয়া হরেনের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইবে! এ কাহিনী সে সন্ত শুনিয়া আসিয়াছে···রঙ্গিয়ায় প্রকাশের মামা নিরঞ্জনবাবুর কাছে! এতদূর যখন মিলিয়া গিয়াছে···এবার তবে তার পালা, সত্যই?

কিন্তু তাকে ইহাদের দেবী কেন ডাকিবেন? সে তো ইহাদের দেবতাকে তাচ্ছল্য করে নাই! অপমান করে নাই! কোনো দিন না!

হরেন বলিল—এ বছর আমি এসেছি তোমাদের দেবতার ডাকে?

পুরোহিত বলিল—তাই।

হরেন বলিল—কিন্তু আমি তোমাদের দেবতাকে কোনোদিন অপমান করিনি, তাচ্ছল্য করিনি। তোমাদের দেবতা যদি সত্যকারের দেবী হন, অন্তর্য্যামী হন, তাহলে নিশ্চয় তিনি জানেন, আমি সকলের সব দেবতাকে সমান ভাবে মানি, ভক্তি করি।

পুরোহিত হাসিল। হাসিয়া বলিল—সে-মানা মেনে আমাদের দেবতাকে যেন কৃতার্থ করছো, তাই মানো! যেন তোমার মন খুব উদার···এই অহঙ্কার-বশে মানো! তুমি না মানলে আমাদের দেবতার কোনো ক্ষতি হবে না···যে-দেবতা,

সেই দেবতাই তিনি থাকবেন! তুমি ভাবো, তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি অগাধ। সে বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে তুমি অন্য জাতের দেবতাকে মানো বলে' প্রচার করো। তাছাড়া তোমাদের এই অহঙ্কারে পৃথিবীতে দুঃখ-অশান্তি বাড়ছে বৈ কমছে না! বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কারে তোমরা পৃথিবীতে যে অশান্তি-বিরোধের সৃষ্টি করছো …কোনোদিন তার নিবৃত্তি হবে না!

হরেন বলিল,—তুমি কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে' বলো।

পুরোহিত বলিল—ওপারে তোমাদের জাতের মধ্যে কেউ কেউ বলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান যতদিন ছিল না, ততদিন পৃথিবীতে ছিল শান্তি আর সুখ। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে তোমরাই পৃথিবীতে এনেছো মরণ আর রাজ্যের দুঃখ-কষ্ট! এ-কথা জেনেও অহঙ্কার বশে তোমাদের জ্ঞান-চর্চ্চার বিরাম নেই। জ্ঞান-চর্চ্চা বেড়ে চলেছে!…এ-জ্ঞান যত বাড়ছে, তোমাদের মন তত হিংসুটে হচ্ছে……পরশ্রীকাতর হয়ে ততই তোমরা অনর্থ সৃষ্টি করছো!

হরেন ঝাঁজিয়া উঠিল। বলিল—তার মানে, তুমি বলতে চাও…

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিল—চটো না! সত্য কথা তোমরা সইতে পারো না, জানি। জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে তোমাদের মন এমন হয়েছে যে চাটু-বাণী ছাড়া আর কোনো বাণী তোমাদের ভালো লাগে না! তোমাদের অহঙ্কার এত বাড়ছে যে অহং-ছাড়া আর কিছু জানো না…পরোপকার করতে বসেও তোমরা আগে নিজেদের লাভের হিসেব কষো। তাছাড়া…

পুরোহিত চুপ করিল।

হরেন বলিল—বলো…থামলে কেন?

পুরোহিত বলিল—তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বাড়বার বিষয়ে শুধু একটি কথা বলবো···

হরেন বলিল—বলো···

পুরোহিত বলিল—পাশের পড়শীর বাড়ীর ছায়া যদি তোমাদের বাড়ীর উঠোনে এসে পড়ে, তোমার আলো-বাতাস বন্ধ হয়েছে বলে বিরোধ জাগিয়ে তোলো···পড়শীকে মামলা-মকর্দ্দমার বাণে বিদ্ধ জর্জ্জরিত করতে ছোটো! যে-টাকা তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান-মন্ত্র···তোমাদের সেই টাকা আদালতে ঢেলে দাও! তোমরা বলো, তোমাদের হক্···অপরে কেন তা তুচ্ছ করবে? আগে যখন এত বিদ্যা শেখনি, এত জ্ঞান হয়নি ···তখন এত বিরোধ, এ সমস্ত উৎপাতও ছিল না! জ্ঞানের অহঙ্কারে দুনিয়ার অন্য-জাতকে ঘৃণা করো, অবজ্ঞা করো···এই তো তোমাদের জ্ঞানের ফল!···এ-জ্ঞানের ফলে সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য হারিয়েছো। তোমাদের মনে সব-সময়েই অসন্তোষ। কিছুতে আরাম পাও না। মনে দারুণ পিপাসা···সে পিপাসা মিটতে জানে না! সে পিপাসা শুধু তোমাদের ঐ বুদ্ধির আর জ্ঞানের গরম ঝাঁজে···ও-ঝাঁজে মন তোমাদের সব-সময় মরুভূমি হয়ে আছে! বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে নেমন্তন্ন করে' খাওয়াবে, তাতেও মনে খুঁৎখুতুনি—কতক্ষণে এ জঞ্জাল চুকবে! অপরকে খুশী করতে চাও, তবু মনে অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্যের কাঁটা বিঁধে থাকে! তোমাদের মনে দারুণ কাপট্য···মনের সঙ্গে ছলনা না করে বলে তো বাপু, স্বার্থ ছাড়া তোমরা আর কিছু চাও? অথচ যাদের তোমরা বলো মূর্খ, অসভ্য, তারা কাপট্য জানে না···তোমাদের মতো তারা স্বার্থপর নয়!

এ কথার উত্তরে হরেনের মুখে কোনো কথা বাহির হইল

না। মন বলিতে লাগিল, কথাগুলা ঠিক নয়···তবু বেঠিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না! জ্ঞানের সূক্ষ্মতা যত বাড়িতেছে, বিরোধ-হিংসা সত্যই তত বাড়িতেছে! কিন্তু এ কি জ্ঞানের ফলে···?

মনের উপর যেন চিন্তার পাহাড়! হরেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল···মাথা ঘুরিয়া হরেন মূর্চ্ছিত হইল।

দশ

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, কিন্তু দেহে শক্তি নাই! মনের উপর যেন কিসের পর্দ্দা পড়িয়া মনকে ঢাকিয়া দিয়াছে! হরেন কিছু বুঝিতে পারে না!

মাঝে মাঝে দু' একটা স্মৃতি···অন্ধকার আকাশে দু'চারিটা মলিন নক্ষত্র···বহু চেষ্টা করিলে সে নক্ষত্র যেমন চোখে পড়ে, তেমনি···

হরেন ভাবে, প্রকাশ···সে সঙ্গে ছিল! যেন অনেক দিন আগে! তার সঙ্গে যেন কোথায় গিয়াছিল! তারপর কবে কি করিয়া দুজনে ছাড়া-ছাড়ি···সে-সব যেন কেমন আবছায়া··· ভালো মনে পড়ে না!

চেতনা মাঝে-মাঝে জাগ্রত হয়। ক্ষণেকের জন্য। তারপর নিদ্রার নিবিড় ঘোর! চেতনা জাগিলে সে উঠিয়া বসিতে চায়। ভাবে, কি আমার হইয়াছে? মন্ত্র পড়িয়া উহারা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হরণ করিয়া লইল না কি?

তা কি সম্ভব?

চেতনা আবার তখনি ঘুমঘোরে মিলাইয়া মূর্চ্ছিত হয়! মনে হয়, যেন মৃত্যু আসিয়াছে···এ জগতের কথা কেন আর ভাবিয়া মরি!

সেদিন চেতনা জাগ্রত হইলে কাণে শুনিল জলদ-গম্ভীর স্বর! —তোমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করো। কে চায় তোমাদের

···ছেলেটাকে তুলে নিল একেবারে পিঠের উপরে·

জ্ঞান? এই জ্ঞানের ফলে মৃত্যু আনিয়াছ! জানিয়া-শুনিয়াও জ্ঞান-বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া তার ফলের উপর এখনো এত লোভ? তোমরাই জগতে দুঃখ-কষ্ট আনিয়াছ! মানুষের সব শক্তি, সব সুখ কাড়িয়া লইয়াছ! এত জ্ঞান যখন ছিল না, তখন মানুষে-মানুষে এত বিবাদ ছিল না, বিরোধ ছিল না! জ্ঞানের সূক্ষ্ম অর্থ যত আয়ত্ত করিতেছ, ততই দাবীর ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া কি দুঃখই না তোমরা বহিয়া আনিতেছ! সেই জন্যই তোমাদের জ্ঞানের দর্প আমরা চূর্ণ করিয়া দিতে চাই! যে-জ্ঞানের জন্য এত বিরোধ, এত অশান্তি, সে-জ্ঞান দূর করিয়া আমরা চাই পৃথিবীতে অজ্ঞান আনিতে...সেই সঙ্গে চিরদিনকার সেই হারানো শান্তিকে!

কোনোমতে চোখ চাহিয়া হরেন দেখিল, সেই বুড়া পুরোহিত। সে একা নয়। হরেনকে ঘিরিয়া আরো অনেক পাহাড়ী লোক!

হরেন বলিল—আমার অসুখ করেছে?

জবাব শুনিল—না।

হরেন বলিল—আমি বেঁচে আছি?

জবাব শুনিল—আছো।

হরেন বলিল—মরণ আসছে?

জবাব,—আসছে।

হরেন বলিল—যদি মারো, একটু দয়া করে শীগগির তোমাদের কাজ শেষ করে নাও।

জবাব—তোমার হুকুমে কিছু করবো না। দিন-ক্ষণ দেখে করতে হবে।

হরেন বলিল—যত ভক্তি থাকুক, জীব-বলি দিয়ে দেবতাকে

তৃপ্ত করতে তোমরা পারবে না। দেবতাতে আর শয়তানে তফাৎ আছে! দেবতা চায় জীবন! শয়তানই শুধু প্রাণ নিয়ে মরণের খেলা খেলে।

উত্তরে শুনিল তীব্র ভৎর্সনা—চুপ!

তারপর আবার তন্দ্রার ঘোর! আলো-বাতাস সব মুছিয়া গেল!

এবার জ্ঞান হইলে চোখ খুলিয়া হরেন দেখে, শুইয়া আছে। মাথার উপর নীল আকাশ।

বুঝিল, খাটিয়ায় শোয়াইয়া কারা তাকে বহন করিয়া চলিয়াছে। গা ছম্‌ছম্‌ করিল! সে তবে বাঁচিয়া নাই? মানুষ মরিয়া গেলেই এমনি করিয়া পাঁচজনে তাকে বাহিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু না, সে বাঁচিয়া আছে! এই যে নিশ্বাস···চোখের উপর ঐ আকাশ! আকাশের নীচে চিরদিনের পরিচিত সেই শ্যামল বনানী···নদী-নির্ঝর···

কাণে আসিয়া লাগিল ঢোল-মাদুলের রব।

খাটিয়া ভূমে নামানো হইল।

হরেন দেখিল, সামনে বেদী···বেদীর উপর দেবী-মূর্ত্তি সেই দেবী! মাথা নাই, মুখ নাই! ছিন্নমস্তা দেবী।

দেবীর সামনে বড় থালায় লাল ফুলের রাশ! সিন্দুর··· আর ঐ খড়্গ! তার বুকের রক্ত নিমেষে হিম হইয়া গেল।

পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছে, রক্তপ্রিয়াং রক্তবর্ণাং ছিন্নমুণ্ড-বিভূষিতাম্‌!

হরেন ভাবিল, এমন নিশ্চেষ্ট পাথরের মতো শয়তানদের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিব? না! উঠিতে গেল···পারিল না।

হাত-পা বাঁধা···দেহকে খাটিয়ার সঙ্গে লোহার শিকল দিয়া ইহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে !

সামনে আবার চাহিল···স্তূপাকার কাঠ। সে কাঠে ঘৃত ঢালিয়া ঐ আগুন জ্বালিয়া দিল ! দীর্ঘ লেলিহান আগুনের শিখা !

আগুনের আঁচ গায়ে লাগে···দেহ ঝলশিয়া যায় !

সে আর পারে না ! পাগলের কৌতূহল লইয়া যেমন অজানা পথে বাহির হইয়াছিল, কাহারো পরামর্শ লয় নাই···

মন ভর্ৎসনা করিল,খেয়ালের ঘোরে একটা জন্ম নষ্ট করিলে ! পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান—তার কতটুকু জানো বাপু ? সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছ ! মন তোমার ছোট একটি মধুপর্কের বাটি ! ওটুকু মন জগতের জ্ঞান-সমুদ্রের বারিতে ভরিয়া তুলিবে ? ওরে মূর্খ, ওরে উম্মাদ, তা কি হয় ?

হা-হা-হা অট্টরব···সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর হুড়মুড় করিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! আকাশের বুকে বাজ···বিদ্যুৎ··· বিদ্যুতের শাণিত খাঁড়া !

অসহ্য যাতনা···

হরেন ডাকিল—মাগো···

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা বাহির হইয়া গেল !

তারপর মেঘ-লোক···ছোট-বড় লাল-কালো সাদা-পাঁশুটে মেঘের পর মেঘ···সেই মেঘের স্তর ভেদ করিয়া হরেন চলিয়াছে···চলিয়াছে···চলিয়াছে···! চোখে কিছু দেখা যায় না···শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী ! ধোঁয়া ছাড়া ত্রিভুবনে আর কিছু নাই !···

সঙ্গে সঙ্গে দূরে যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ···সেই সঙ্গে কারা ঐ কথা কহিতেছে···

১। বুনোদের মধ্যে দশজন গ্রেফ্‌তার।

২। এমনি করে মানুষ মারে! ডিটেক্‌টিভ-পুলিশের এত চেষ্টা এতদিনে সফল হলো!

৩। এ-ছেলেটি যখন ভুটিয়া টাট্টু নিয়ে এ-পথে আসছে দেখেছি, তখনি বুঝেছি, একে চার করে এদিককার রুই-কাংলা গাঁথবো!

৪। ভাগ্যে ভুটানী সেজে আগে থেকে বস্তীতে ছিলুম! হা-হা···ত্র্যম্বক, হর্দে আর জরদ···ভুটানীরা ভেবেছিল, আমরা ভুটানী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডিটেকটিভ-পুলিশ ছদ্মবেশে কি না সাজতে পারে! হাঃ-হাঃ-হাঃ···

চোখ খুলিতে হরেনের সাহস হইল না···চোখ খুলিলে যদি দেখে, যমালয়ে আসিয়াছে!

ডিটেকটিভ-ব্যাপারটা স্বপ্ন ?···

সে চোখ বুজিল···ঘুমের ঘোরে দু'চোখ জড়াইয়া আছে!

কাণের কাছে যেন মেঘ ডাকিল···ঘন-গম্ভীর ডমরু-নাদের মতো! সে মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে তালে-তালে ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ···অনেকগুলা ঘোড়া!

হরেন চোখ খুলিল···দেখে, ঘোড়ার পিঠে-চড়া আর সেই শর্ট সার্ট-পরা মূর্ত্তি···একজন নয়, দু'জন নয়, ত্রিশজন···চল্লিশ-জন! ঘোড়ায় চড়িয়া তীরের বেগে এই দিকে আসিতেছে! তাদের হাতে বন্দুক···বন্দুকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী···ঐ ধুরুম্-ধুম্ শব্দ···

কাণে শুনিল ত্র্যম্বকের স্বর—পুলিশ···পুলিশ!

নিশ্চেতনতার পাথর যেন খশিয়া গেল। হরেন উঠিয়া বসিল। ভুটানীদের দলে দারুণ চাঞ্চল্য…

বন্দুকে ঘন-ঘন গুলি ছুটিতেছে…ভুটানীরা ধপাধপ পড়িয়া যাইতেছে…ঐ সব পালায়।

পুরোহিত পলাইল না…হরেনের কাছে আসিল…হুঙ্কার-রবে ডাকিল—মায়িজী…

কি বিকট সে-ডাক…

তারপর…

—হরেন…হরেন…

কে ডাকে?

মর্ত্ত্যের ডিটেকটিভ্ পুলিশ? না, হরেন স্বর্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে?

হরেন চোখ খুলিল।

চোখ চাহিয়া দেখে, ঘরে এক-ঘর লোক…মামাবাবু, মামীমা, প্রকাশ, সনাতন…আরো অনেক লোক…হরেন সকলকে চেনে না।

প্রকাশ ডাকিল—হরেন…

মামাবাবু ডাকিলেন—হরেন…

মামীমা ডাকিলেন—বাবা হরেন…

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন ভালো করিয়া চাহিল। চোখে বিস্ময়ের রাশি।

ভাবিতেছিল, ও-মুল্লুকের দেবতা বলি লইয়া আবার তাকে এ-মুল্লুকে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে? না, ডিটেকটিভ-পুলিশ তাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে?

প্রকাশ বলিল—ও-রকম করে চেয়ে কি দেখছো?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—খুব ভয় পেয়েছিলে ?

মামীমা বলিলেন—ভয় নেই। ভোর হয়েছে, বাবা।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরে পাখীর কণ্ঠে প্রভাতী কূজন···দুঃস্বপ্নের ছায়া ভোরের আলোয় মিলাইয়া যাইতেছিল···

হরেন ডাকিল—মামাবাবু···

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—একটু ভালো বোধ করছো ?

হরেন বলিল—হ্যাঁ। অসুখ নয়। স্বপ্ন দেখছিলুম।

মামীমা বলিল—দুঃস্বপ্ন !

প্রকাশ বলিল—ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন! সে-দুঃস্বপ্নের ঘোরে খাট থেকে মেঝেয়···বাপ্, যে করে পড়েছো! সঙ্গে সঙ্গে কি চীৎকার···

একে একে হরেনের মনে পড়িতেছিল ত্র্যম্বক, পুরোহিত··· সেই বিপর্য্যয়-রকমের সব পাহাড়ী লোক···সেকন্দর, চেঙ্গিজ খান্, নেপোলিয়নের মতো পাহাড়-পথে তার সেই দিগ্বিজয়-যাত্রা···ডিটেকটিভ-পুলিশ···

হরেন বলিল—ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে গিয়েছিলুম···ভুটানী টাট্টু চড়ে। দেবী আমাকে ডেকেছিলেন···সে-ডাক মানুষ এড়াতে পারে না !

মামীমা বুঝিয়া লইলেন, বলিলেন—সনাতন তোমাদের গল্প বলেছে, বুঝি ? কতদিন বলেছি, এ-বয়সের ছেলেদের ও-সব গল্প শুনিয়ো না।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আমার অন্যায়। ভূতের গল্প তুচ্ছ করা যায়। কিন্তু দেবতার গল্প···সত্যি, নরম-মনে বিপর্য্যয় ব্যাপার বাধিয়ে তোলে !

প্রকাশ বলিল—তার উপর হরেনের মনে বড়-বেশী অহঙ্কার! বলে, ও যেমন ফিলজফি বোঝে, এমন আর-কেউ বোঝে না !

হরেন বলিল—তাতে দুঃখ নেই।...স্বপ্ন যা দেখেছি, রীতিমত উপন্যাস!

প্রকাশ বলিল—খেয়ে-দেয়ে লিখে ফ্যালো...আমি খাঁ বেঁধে দেবো।

হরেন বলিল—তামাসা নয়, সতি' বই ঝড়াঝুড় বিক্রী হবে।

শেষ

'প্রাইজ-বুক' হিসেবে—

'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজ'এর বইগুলি অনুপম—অতুলন!

প্রতিমাসে একখানি ক'রে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রকাশিত হয়

প্রথম বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪৮

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। অন্ধকারের বন্ধু

কুজনশ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
হরেন্ ডাকিল—মামাবাবু

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। বিজয়-অভিযান

বুদ্ধদেব বসুর
৫। ছায়া কালো-কালো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। রাত্রির যাত্রী

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
৭। হারাণো বই

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
৮। জীবন্ত-সমাধি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
৯। গুপ্তঘাতক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
১০। মিস্‌মিদের কবচ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
১১। উদাসীবাবার আখড়া

শ্রীসুনির্ম্মল বসুর
১২। কেউটের ছোবল্

দ্বিতীয় বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪৯

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১৩। মুখ আর মুখোস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
১৪। হত্যার প্রতিশোধ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
১৫। নীল আলো

বুদ্ধদেব বসুর
১৬। ভূতের মতো অদ্ভুত

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
১৭। রাতের আতঙ্ক

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
১৮। ঘোর প্যাঁচ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১৯। বিভীষণের জাগরণ!

শ্রীবিমল দত্তের
২০। নিঝুম রাতের কান্না

শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদারের
২১। অভিশপ্ত ম্যমি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২২। স্বর্গের সিঁড়ি

—তারপর পর-পর—

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের
২৩। ওপারের দূত

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়ার
২৪। জয়-পতাকা

প্রত্যেকখানি বারো আনা